অমৃততত্ত্ব

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৩৮

মুদ্রক : দিব্যঙ্কর ভট্টাচার্য্য
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

ওঁ

গুরুপ্রণাম

যিনি আমার প্রশ্নকে বালকের ধৃষ্টতা মনে না করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোর প্রশ্নের বিষয় আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ; এবিষয়ে আমি জানিনা ; শুনেছি উপনিষদে এ সকল কথা আছে ; তোকে বল্‌ছি, বড় হয়ে সংস্কৃত শিখে উপনিষদ পড়্‌বি, তুই জান্‌বি।"

এইভাবে যিনি আমাকে আত্মা, ব্রহ্ম শব্দ দুইটী শিখাইয়াছিলেন এবং উপনিষদ পাঠের দীক্ষা দিয়াছিলেন,

তিনি আমার জীবনের প্রথম গুরু।

আমার পিতৃদেবতা ঈশ্বরচন্দ্র রায়।

তাঁহাকে প্রণাম।

আত্মজ্যোতিঃ আমার জন্য যাঁর মধ্যে প্রথম প্রকট হইয়াছিল, তিনি সেই জ্যোতিঃ উপলব্ধি করিতে আমাকে সতত উৎসাহ দিতেন, তাঁর অফুরন্ত স্নেহ ও অহৈতুকী করুণা আমাকে আজও সিক্ত করিতেছে,

তিনি আমার পূজনীয় গুরু অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

তাঁহাকে প্রণাম।

যিনি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার দিয়াছেন, আমারই জন্য বাঙ্গালা ভাষায় উপনিষদ বিবৃত করিয়াছেন,

তিনি আমার পূজনীয় আচার্য রামমোহন রায়।

তাঁহাকে প্রণাম।

যিনি জগতের গুরু, করুণার আকর,

আমার চির বন্দনীয়।

তিনি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ।

তাঁহাকে প্রণাম।

— প্রণত ঈশান

বিষয় সূচী

অমৃতত্ব

অমৃতত্ব

১

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ

যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদের যুগের ঋষিদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি চারি বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বিদেহ-সম্রাট জনকের সভায় তিনি ঋষিদিগের মধ্যে অনূচানতম (ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ) নির্ধারিত হইয়াছিলেন। ঋষিদিগের সকল কূট প্রশ্নের উত্তর দিয়া তিনি তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন। উদ্দালক আরুণির নিকট তিনি অন্তর্যামী ব্রহ্মের তত্ত্ব ব্যাখা করিয়াছিলেন; গার্গীকে তিনি অক্ষর ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছিলেন; নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে অমৃতত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাট জনককে তিনি আত্মজ্যোতির স্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন, দেহত্যাগ ও জন্মান্তরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম রূপ লোক প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। জনকও দক্ষিণাস্বরূপ বিদেহ রাজ্য এবং নিজেকেও তাহার দাসকর্মের জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে তিনি উদ্যত হইলেন; এই জন্য পূর্বেই পত্নীর অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। তাই তিনি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন যে তিনি কাত্যায়নীর সহিত সম্পত্তি ভাগ করিয়া তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত পৃথিবী যদিই বা বিত্তের

দ্বারা পূর্ণ হয়, তবে তিনি অমৃতা হইবেন কি?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, তাঁহার জীবন বিভবশালীর মতই হইবে; বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। (অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন)।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহার দ্বারা তিনি অমৃতা হইবেন না, তাহার দ্বারা তিনি কি করিবেন? (যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্)।"

তিনি স্বামীকে বলিলেন "আপনি অমৃতত্বের সাধন বলিয়া যাহা জ্ঞাত আছেন, কেবল তাহাই আমাকে বলুন"। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "তুমি আমার প্রিয়া, এখনও আমার প্রিয় কথাই বলিতেছ; এস আমি ব্যাখা করিতেছি, তুমি আমার কথা নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে যত্ন কর।"

মৈত্রেয়ী তাঁহার নিকট অমৃতত্বের উপদেশ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এই অমৃতত্ব-লাভের জন্য মানুষের অন্তরের চিরন্তন আকূতি। প্রত্যেক মানুষেরই "আমিবোধ (অহংপ্রত্যয়)" আছে। এই "আমি" যেন চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, "আমি" নাই, এইরূপ যেন কখনও না হয়, ইহাই মানুষের অন্তরের প্রার্থনা। কারণ এই "আমি"ই মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয়; অপর সব কিছুই মানুষ অস্বীকার করিতে পারে কিন্তু এই "আমি"র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নিঃসংশয়। পুত্রের প্রতি, বিত্তের প্রতি তাহার প্রেম আছে; কিন্তু "আমি"র প্রতি তাহার প্রেমই মুখ্য প্রেম। পুত্র প্রিয়, যেহেতু সে আমার পুত্র; বিত্ত প্রিয়, যেহেতু তাহা আমার প্রয়োজন সাধন করে; কিন্তু "আমি"র প্রতি যে প্রেম তাহা অহৈতুক, স্বাভাবিক। এই "আমি"কেই আত্মা বলিয়া মানুষ জানে। কিন্তু এই "আমি", দেহ প্রাণ

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সহিত সংহত চৈতন্য, একথা মানুষ জানে না। সে এই দেহাদির সহিত সংহত চৈতন্যকে সত্য মনে করে; এবং এই সংহত-আত্মাকে সে নিত্যস্থায়ী করিতে চাহে। ইহাই তাহার অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছার প্রকৃত তাৎপর্য। কিন্তু মানুষ জানে না, যাহা সংহত তাহা বিগলিত হয়, যাহা সংযুক্ত তাহা বিযুক্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন আত্মাই অমৃত, ব্রহ্ম (স বা এষ, মহান্ অজ আত্মা, অজরঃ, অমরঃ, অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম)। শ্রুতি আরো বলিয়াছেন ভূমাই অমৃত (যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্); সুতরাং আত্মাই, ব্রহ্মই, ভূমাই অমৃত। আত্মাকে লাভই অমৃতত্বলাভ। আত্মা প্রজ্ঞানঘন। প্রজ্ঞানঘনস্বরূপ উপলব্ধিই কৃতকৃত্যতা।

বৃহদারণ্যকের তিনটি কাণ্ড বা ভাগ আছে। প্রথমটির নাম মধুকাণ্ড; ইহা আগমপ্রধান; ইহাতে শ্রুতি আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, "আত্মা" পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, যেহেতু আত্মা ইহাদেরও অন্তরতর (তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা)। এই আত্মার প্রতি প্রেমই মুখ্য প্রেম; অপর সকল বস্তুর প্রতি প্রেম গৌণ, অবান্তর মাত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। দেহাদির সহিত সংহত অমুখ্য আত্মা জায়া, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতিকে "আমার" পুত্র ইত্যাদি মনে করিয়া ভালবাসে। এই ভালবাসা "মমত্ব"-বোধ অর্থাৎ আসক্তি মাত্র; কিন্তু আসক্তি ত্যাগ না করিলে আত্মলাভ সম্ভব নহে; তাই মৈত্রেয়ীর আসক্তি দূর করিবার জন্য তিনি বলিলেন "হে মৈত্রেয়ী, পতির প্রতি পত্নীর যে প্রেম, তাহা পতির প্রয়োজনে নহে, পত্নীর নিজের প্রয়োজনে।" (ন বা

অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তুকামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি)। এখানে মনে রাখিতে হইবে, "আত্মনস্তু কামায়" মন্ত্রাংশটীতে মুখ্য আত্মার কথা বলা হয় নাই, কারণ মুখ্য আত্মার কামনা নাই; এখানে আত্মনঃ শব্দের অর্থ "নিজের" অর্থাৎ অমুখ্য আত্মার; কাম শব্দের অর্থ প্রয়োজন বা অভিলাষ। এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, জায়ার প্রতি পতির প্রেম জায়ার প্রয়োজনে নহে, কিন্তু পতির নিজের প্রয়োজনে। এইরূপে তিনি দেখাইলেন পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, দেবগণ ভূতগণ, স্বর্গাদি লোক, ও সকল বস্তুর প্রতি যে প্রেম, তাহা সেই সকলের জন্য নহে, কিন্তু নিজের প্রয়োজনে: এই সকল প্রেমই মমত্বপ্রসূত, সুতরাং আসক্তি মাত্র। কিন্তু মুখ্য আত্মার প্রতি প্রেম স্বাভাবিক। পূর্বে শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে যে আত্মা পুত্র ও বিত্ত হইতে প্রিয়: শ্রুতির কথাই যাজ্ঞবল্ক্য যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি আবার বলিলেন, "এই আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে; সেই জন্য আচার্য বা শাস্ত্রের উপদেশ শুনিতে হইবে; যুক্তির দ্বারা নিজের অন্তরে তাহার মনন করিতে হইবে, এবং নিশ্চিত হইয়া সেই তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান করিতে হইবে।" (আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ)। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে আত্মা দৃষ্ট হইলে, অর্থাৎ বিদিত হইলে, সমগ্র জগৎ বিদিত হয়।

"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণজাতি পরাভূত করেন, কারণ সবই আত্মা, এই উপলব্ধি হইতে তিনি বঞ্চিত হন; এইরূপে ক্ষত্রিয় জাতি, স্বর্গ প্রভৃতি লোক, দেবতাগণ, ভূতগণ, আত্মা হইতে পৃথক, এইরূপ যিনি জানেন, তিনি এই সকলের দ্বারা পরাভূত

হন।" যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন "এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, লোকসকল, প্রাণীসকল,—এই সবই আত্মা" (ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা)।

স্থিতিকালে সমগ্র জগৎ আত্মাই, ইহা বুঝাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন—"ঢাকে আঘাত হইতে থাকিলে, তাহা হইতে ধ্বনিত বিশেষ বিশেষ শব্দগুলিকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু এগুলি ঢাকের আঘাতের শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলে, বিশেষ শব্দগুলিও গৃহীত হয়। শঙ্খ ধ্বনিত হইলে, বিশেষ বিশেষ শব্দ গুলি গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু ইহা শঙ্খবাদনের শব্দ এইরূপে গ্রহণ করিলে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলিও গৃহীত হয়। বীণা বাদিত হইতে থাকিলে, বিশেষ বিশেষ শব্দ গুলিকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু ইহা বীণারই ঝঙ্কার, জানিলে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলিও গৃহীত হয়।"

যাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল উদাহরণের তাৎপর্য এবং পরবর্তী অংশে যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে, বেদান্তের দুইটী যুক্তির আলোচনা কর্তব্য। ইহাদের একটী পরাপর-সামান্যভাব (The relation of genus and species) এবং অপরটি একায়নপ্রক্রিয়া।

বেদান্ত "জাতি" (class concept) স্বীকার করে না, কিন্তু তাহার পরিবর্তে সামান্য, বিশেষ, পরসামান্য, অপরসামান্য প্রভৃতি সম্বন্ধ স্বীকার করে। উদাহরণের দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে। কলিকাতার একটী নারী বেশভূষায়, বর্ণে, ভাষায়, আহারে, ভারতের অপর সকল নারী হইতে পৃথক্ অর্থাৎ সে বিশেষ নারী। কিন্তু ভারতের চারি প্রান্তের অপর চারিটী নারীর সহিত তাহাকে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাদের

আকৃতিগত, ভাষাগত, আচরণগত সমস্ত প্রভেদ বিলীন হইয়া যাইবে এবং ভারতীয় নারী এই বোধই থাকিবে। এখানে ভারতীয় নারী সামান্য, কলিকাতার নারী বিশেষ; যাহা বিশেষ, তাহা ভারতীয় নারীরূপ সামান্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল নারীর সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইলে, পৃথিবীর নারী হইবে পরসামান্য, ভারতের নারী অপরসামান্য; কলিকাতার নারী বিশেষ। এইভাবে বিশেষ সামান্যে ও অপরসামান্য ব্যাপকতর পরসামান্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং প্রতিক্ষেত্রেই ইহাদের বৈশিষ্ট্য বিলীন হইয়া যায়।

ঢাক কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত তালে ধ্বনিত হয়। পৃথক পৃথক শব্দকে ধরিয়া রাখা যায় না; ইহা ঢাকের আঘাতের শব্দ ইহা জানিলে শব্দটী গৃহীত হয়, অর্থাৎ বিশেষ শব্দগুলি, বিশেষত্ব হারাইয়া সামান্যে বিলীন হয়। এইরূপে শঙ্খের বিশেষ বিশেষ শব্দ, শঙ্খের শব্দসামান্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বীণা বিশেষ সুরে বিশেষ তালে ঝঙ্কৃত হয়; কিন্তু সেই বিশেষ বিশেষ ঝঙ্কার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বীণার শব্দসামান্যে বিলীন হয়। এইরূপে ঢাকের, শঙ্খের এবং বীণার শব্দসামান্য একত্র গ্রহণ করিলে তাহারা শুধু শব্দসামান্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন শব্দসামান্য হয় পরসামান্য, এবং ঢাকের, শঙ্খের ও বীণার শব্দসামান্যগুলি হয় অপরসামান্য। ইহাই পরাপরসামান্য ভাব। উপনিষদ বলিয়াছেন, জগৎ-প্রপঞ্চ আত্মা হইতে উদ্ভূত; এবং এই প্রপঞ্চ সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া আত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং জগৎ আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে, তাহা আত্মস্বরূপ।

উৎপত্তিকালের পূর্বে এবং উৎপত্তিকালেও, জগৎ আত্মা

হইতে অতিরিক্ত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন—"আর্দ্রকাষ্ঠ দ্বারা সম্যক প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন ধূম নির্গত হয়, তেমনি ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদ, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান প্রভৃতি এই মহৎ ভূতের (পরমাত্মার) নিঃশ্বাসস্বরূপ।"

ভিজা কাঠের দ্বারা আগুন জ্বালাইলে ধূম, শিখা, স্ফুলিঙ্গ, অঙ্গার প্রভৃতি নির্গত হয়; কিন্তু এ সকলের নির্গমনের পূর্বে একমাত্র অগ্নিই থাকে। তেমনি জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান। নামরূপের অভিব্যক্তির সঙ্গে আত্মা হইতে বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র, অযত্ননিঃসৃত নিঃশ্বাসের ন্যায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে ও সৃষ্টিকালে একমাত্র আত্মাই বর্তমান।

সৃষ্টি ও স্থিতিকালের ন্যায় প্রলয়কালেও একমাত্র আত্মাই বর্তমান, ইহা বুঝাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য আবার বলিলেন—"সমুদ্র যেমন সকল জলের একায়ন (The final resort, the goal, অবিভাগপ্রাপ্তির স্থান) সেইরূপ ত্বক্ সমস্ত স্পর্শের একায়ন, এইরূপে নাসিকাদুইটী সকল গন্ধের একায়ন, এইরূপে জিহ্বা সকল রসের একায়ন, এইরূপে চক্ষু সকল রূপের একায়ন, এইরূপে শ্রোত্র সকল শব্দের একায়ন, এইরূপে মন সকল সঙ্কল্পের একায়ন, এইরূপে হৃদয় (অর্থাৎ বুদ্ধি) সকল বিদ্যার একায়ন, এইরূপে হস্তদ্বয় সকল কর্মের একায়ন, এইরূপে উপস্থ সকল আনন্দের একায়ন, এইরূপে পায়ু সকল বিসর্গের (মলত্যাগের) একায়ন, এইরূপে দুইটী পদ সকল পথের (অর্থাৎ চলার) একায়ন, এইরূপ বাক্ সকল বেদের (বাক্যের) একায়ন।"

মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহাদের দ্বারা মানুষ জ্ঞানলাভ করে। চক্ষুর দ্বারা রূপদর্শন করে, কর্ণের দ্বারা শব্দশ্রবণ, নাসিকার দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা রসের আস্বাদন এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শের অনুভব করে। বাক্, পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এই পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয়; বাক্-এর দ্বারা বেদ অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণ, পাণি দ্বারা গ্রহণ, পাদের দ্বারা পথভ্রমণ অর্থাৎ চলন, পায়ু দ্বারা ত্যাগ (মলত্যাগ) এবং উপস্থ দ্বারা আনন্দ অনুভব করে; তাহা ছাড়া মন ও বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ত্বক্ সমস্ত স্পর্শের একায়ন; শীতল, উষ্ণ, কোমল, কঠিন, মসৃণ, কর্কশ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্পর্শ ত্বকেই অনুভূত হয়, ত্বক ব্যতীত অন্য কিছুতেই অনুভূত হয় না, অর্থাৎ ত্বকই স্পর্শসামান্য; এইরূপ চক্ষু, রূপসামান্য এবং শ্রোত্র, শব্দসামান্য। বিশেষ বিশেষ জলধারা যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ গন্ধ নাসিকাতে অর্থাৎ গন্ধসামান্যে, বিশেষ বিশেষ রস জিহ্বাতে অর্থাৎ রসসামান্যে, বিশেষ বিশেষ রূপ চক্ষুতে অর্থাৎ রূপসামান্যে এবং বিশেষ বিশেষ শব্দ শ্রোত্রে অর্থাৎ শব্দসামান্যে বিলীন হয়। সুতরাং যাহা বিশেষ, তাহা সামান্য হইতে অতিরিক্ত নহে। অর্থাৎ সামান্যের অতিরিক্ত সত্তা বিশেষের নাই।

নিজের অভিজ্ঞতায় মানুষ ইহাও জানে যে মনঃসংযোগ না থাকিলে রূপ রসাদি গৃহীত হয় না। যে বালক গণিতের প্রশ্নের সমাধানে তন্ময়, সে উচ্চ শব্দও শুনিতে পায় না। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনে অর্পিত হয়।

মন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ; সুতরাং শব্দ ধ্বনিত হইলেই মনে প্রশ্ন জাগে, ইহা কি শব্দ, না অন্য কিছু ? সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন মন কর্তৃক বুদ্ধিতে অর্পিত হয় ; বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, সুতরাং সে অবধারণ করে, ইহা শব্দ ; এই ভাবে শব্দ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার শব্দত্ব দূর হয় এবং জ্ঞানমাত্র থাকে ; ইহাই বুদ্ধি-জ্ঞান। এই বুদ্ধিজ্ঞান বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে বিলীন হয়। এইভাবে, রূপরসাদি আত্মাতে বিলীন হয়। ইহাই একায়ন প্রক্রিয়া।

কর্মেন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া বাক্য উচ্চারণ, গ্রহণ, চলন, উৎসর্গ (মলত্যাগ) ও আনন্দ। এই সকল ক্রিয়ারও বহু বিশেষ ও সামান্য প্রকার আছে। এক জাতীয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-সকল সেই জাতীয় ক্রিয়া-সামান্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ক্রিয়া-সামান্যসকল এক পরক্রিয়াসামান্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কৌষীতকি শ্রুতি বলিয়াছেন "যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ, যাহাই প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা।" (যোবৈ প্রজ্ঞা স প্রাণা, যোবৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা।") প্রজ্ঞা ও প্রাণ, একার্থক ; এই দুইই আত্মা ; এইভাবে সবই আত্মস্বরূপ ; আত্মার অতিরিক্ত কিছু নাই।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ক্রিয়াকালে শক্তির প্রকাশ দেখা যায় ; সেই শক্তির কি হয় ? উত্তরে বেদান্তী বলেন, শক্তির সত্তা ক্রিয়া দ্বারাই প্রমাণিত হয়, তাহা ছাড়া সেই সত্তার প্রমাণ নাই। আমি হাত প্রসারিত করিলাম, ইহাতেই হাতের শক্তির সত্তার প্রমাণ পাওয়া গেল ; তাহা ছাড়া অন্য প্রমাণ নাই। তাহা ছাড়া, প্রসারণের জন্য স্থান পরিবর্তন ভিন্ন হাতের অন্য কোন পরিবর্তন হইল না ; হাত যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। এই জন্য প্রাচীন আচার্যেরা শক্তিকেও অবিদ্যা বলিয়া গণ্য

করেন। শক্তি আছে এ কথাও বলা যায় না, নাই এ কথাও বলা যায় না। সুতরাং শক্তির লয় হয় কিনা এ প্রশ্নও উঠে না।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে—রূপ, রসাদি বিষয় বিলীন হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির কি হয়? বেদান্ত বলেন—ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়সকলের সমজাতীয়; সুতরাং বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়েরও বিলয় হয়। এ বিষয়ে লৌকিক প্রমাণ এই, চক্ষু রূপকে প্রকাশ করে, প্রদীপও তাহাই করে; প্রদীপ তেজ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং চক্ষুও তেজ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং চক্ষু রূপের সমজাতীয়; সুতরাং রূপের বিলয়ের সহিত চক্ষুরও বিলয় হয়।

এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে। বেদান্ত বলেন অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে অজ্ঞানাবৃত চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। এইগুলির নাম পঞ্চ ভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র। আকাশের সাত্ত্বিক অংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিক অংশ হইতে ত্বক্, তেজের সাত্ত্বিক অংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিক অংশ হইতে নাসিকার উৎপত্তি হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ-ভূতের উৎপত্তিকালে আকাশে শব্দগুণ অভিব্যক্ত হয়, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ অভিব্যক্ত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে রূপ প্রভৃতি বিষয় এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমজাতীয়; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সকলের সামান্য অবস্থা মাত্র। সুতরাং বিষয়সকলের বিলয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সকলও বিলীন হয়।

পুরাণে আছে যে কল্পান্তে জগৎ প্রলয়ে বিলীন হয়; সেই জগৎ প্রলয়ের অবসানে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞানের দ্বারা যখন জগৎ আত্মাতে বিলীন হয় তখন তাহার পুনরাবির্ভাব হয় না; সুতরাং আত্মজ্ঞানের দ্বারা জগৎ-এর আত্যন্তিক বিলয় ঘটে।

ইহা বুঝাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন, "লবণপিণ্ড (সৈন্ধবখিল্য) জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, জলেই অনুবিলয় প্রাপ্ত হয়; তখন কেহই তাহা পৃথক করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যে স্থান হইতেই জল লইয়া আচমন করে, তাহা লবণই হয়। এই মহদ্ভূত (পারমার্থিক বস্তু) অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনই; এই সকল ভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া এই সকলেই অনুবিনাশ প্রাপ্ত হয়।" (ইদং মহদ্ভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেব অনুবিনশ্যতি)।

'বিনাশানন্তর বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না; আমি তোমাকে বলিতেছি,' এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন। (ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি অরে ব্রবীমি ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ)। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির তাৎপর্য এই:—সমুদ্রের লবণাক্ত জল উত্তাপে শুষ্ক হইয়া কঠিন লবণখণ্ডে পরিণত হয়। সমুদ্রের জল শুষ্ক হওয়াতেই সেই খণ্ড উৎপন্ন হইল। ইহা জলের বিলয়। জলই সৈন্ধবখণ্ডের কারণ; সেই সৈন্ধবখণ্ড জলে অর্থাৎ নিজের কারণবস্তুতে নিক্ষিপ্ত হইলে জলস্বরূপই হয়। ইহাই সৈন্ধব খণ্ডের অনুবিলয়। ইহার অর্থ বস্তুটি কারণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মানুষও নিজেকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহাদির সহিত সংহত চৈতন্য মনে করিয়া ভাবে, "আমি অমুক", "আমি অমুকের পুত্র", "আমি

মরিব" "আমি রুগ্ন" ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের যে চৈতন্য, তাহা মহদ্ভূত অর্থাৎ পরমার্থ সত্য আত্মা ; তাহা অনন্ত, সুতরাং আত্মার শেষ নাই ; তাহা অপার সুতরাং কোনও বস্তু হইতে আত্মা পৃথক নহে ; তাহা বিজ্ঞানঘন ; আত্মা শুধুই বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্য কোনও বস্তু আত্মাতে নাই, সুতরাং আত্মা অদ্বৈত। নামরূপাত্মক বস্তুসকলই ভূত, এই ভূতের সহিত অবিদ্যাজনিত তাদাত্ম্যবশতঃ আত্মার খিল্যভাব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সেই খিল্যভাব সত্য নহে। অলক্তকের সংস্পর্শে স্বচ্ছকাচ রক্তবর্ণ দেখায় ; কিন্তু অলক্তক দূর হইলে স্বচ্ছকাচই থাকে ; তেমনি ব্রহ্মসাধনার ফলে ঐ অবিদ্যাজনিত তাদাত্ম্যবোধ নষ্ট হইলে মহদ্ভূত আত্মাই বর্তমান থাকেন। খিল্যভাব প্রাপ্তিই বিনাশ এবং তাদাত্ম্যবোধের নাশই অনুবিনাশ। যাজ্ঞবল্ক্য আরো বলিলেন, বিনাশের অনন্তর অর্থাৎ খিল্যভাব নষ্ট হইলে মহদ্ভূত আত্মাতে বিশেষ সংজ্ঞা অর্থাৎ "আমি," "আমার" ইত্যাদি বিশেষ বোধ থাকে না।

মৈত্রেয়ী বলিলেন "হে ভগবান্, আমি মোহগ্রস্ত হইয়াছি"। যাহা বিজ্ঞানঘন তাহা সংজ্ঞারহিত হয় কি প্রকারে, ইহাই মৈত্রেয়ীর সমস্যা। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যাহা বিজ্ঞানঘন, তাহাই সংজ্ঞারহিত হয়, একথা তিনি বলেন নাই ; অবিদ্যাজনিত খিল্যভাবকালে, শরীরের সংযোগহেতু যে সকল "আমি, আমার, অমুক" ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞান হইয়াছিল বিদ্যাদ্বারা খিল্যভাব নষ্ট হইলে ঐ সকল বিশেষ জ্ঞান আর থাকে না।

এখানে বক্তব্য এই ;—সমুদ্রজল তাপযোগে কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে সৈন্ধবখিল্য বা লবণখণ্ড হয় ; পুনরায় জলের স্পর্শে সেই কঠিন লবণখণ্ড পুনরায় সমুদ্রজলেই পরিণত হয় ; তাহাতে অন্য

কোন পদার্থ থাকে না। সুতরাং লবণখণ্ড স্বরূপতঃ সকল সময়ই সমুদ্রজল, তাহা ছাড়া কিছুই নহে। মানুষও তেমনি অবিদ্যাজনিত ভ্রমের বশে মহদ্ভূত পরমাত্মা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ হেতু বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করে; ইহাই মানুষের খিল্যভাবপ্রাপ্তি। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইলে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধও নষ্ট হয়; তখন মানুষের ব্যক্তিবোধও দূর হইয়া যায় এবং সে মহদ্ভূত পরমাত্মাই হয়; অর্থাৎ জীব ভ্রমের বশে নিজেকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বোধ করিয়া জন্মমরণের চক্রে পিষ্ট হয়, কিন্তু ভ্রম দূর হইলে সে পরমাত্মাই হয়। সুতরাং জীব, সকল সময়েই সকল অবস্থায়ই, পরমাত্মা। জীব কখনোই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ বিজ্ঞানঘন পরমাত্মাই একমাত্র সত্য, জীবাত্মা কল্পনামাত্র; ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত; সুতরাং জীবাত্মা সম্বন্ধে অন্য যত প্রকার মত আছে, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ।

বিনাশানন্তর বিশেষ সংজ্ঞা কেন থাকে না (ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি) তাহা বুঝাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন, —"অবিদ্যাবস্থায় যখন, যেন দ্বৈত, যেন ভিন্ন ভিন্ন, বলিয়া প্রতীত হয়, তখন অপরে অপরকে আঘ্রাণ করে, অপরে অপরকে দেখে, অপরে অপরকে অভিবাদন করে, অপরে অপরকে চিন্তা করে, অপরে অপরকে জানে। বিদ্যাবস্থায়, যখন এই সাধকের কাছে সবই বিজ্ঞানঘন আত্মা হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে চিন্তা করিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে? যে বিজ্ঞানের দ্বারা

মানুষ সব কিছু জানে, সেই বিজ্ঞানঘনকে কিসের দ্বারা জানিবে? হে মৈত্রেয়ী, বিজ্ঞাতাকে মানুষ কিসের দ্বারা জানিবে?" (যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি; যত্র বা অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াং। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়ায়াৎ?)

ইহার তাৎপর্য এই,—যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞানের অধীন থাকে, ততক্ষণ সে নিজেকে পরিচ্ছিন্ন, বিশেষ ব্যক্তি, বলিয়া বোধ করে এবং অপর সব বস্তুকেই পরিচ্ছিন্ন পৃথক বলিয়া ধারণা করে। এই ধারণার বশে সে অপর সব মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করে, নিজের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করে; তার ধর্ম কর্ম সবই এইভাবে অজ্ঞানেরই ফল। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, দেশের বিপদ নিবারণ, শিক্ষাপ্রচার, যাগ যজ্ঞ উপাসনা প্রভৃতি ধর্ম কার্যও এই অজ্ঞানজনিত দ্বৈতবোধেরই ফল। কিন্তু যখন তাহার আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তখন তাহার কাছে সবই আত্মা হইয়া যায়; আত্মা ভিন্ন কিছু না থাকায় দ্বৈতবোধও চলিয়া যায়, দ্বৈতবোধ না থাকায় কোন ব্যবহার বা কর্তব্য বা ধর্মসাধন সম্ভব হয় না।

"বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে?" (বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ) যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির তাৎপর্য কি? বিজ্ঞাতা শব্দের লৌকিক অর্থ, জ্ঞানের কর্তা অর্থাৎ যিনি জানিতেছেন তিনি। কিন্তু এখানে বিজ্ঞানকেই অর্থাৎ বিজ্ঞান-ঘন আত্মাকেই বুঝাইতেছে; বৃহদারণ্যকে অন্যত্র আত্মাকে দ্রষ্টা

ও দৃষ্টি, এই উভয়ই বলা হইয়াছে। 'কেন' শব্দের অর্থ কিসের দ্বারা, অর্থাৎ কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (জানিবে)। যে সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ করে, সেই সব ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানঘন আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির তাৎপর্য। তুমি চক্ষু মেলিলে, তোমার চক্ষু পদ্মের উপর পড়িল; তাহাতে তোমার পদ্মের জ্ঞান হইল। তোমার চক্ষু তোমার মস্তকে অবস্থিত; পদ্মফুল বাহিরে, দূরে অবস্থিত, এই ইন্দ্রিয় ও ফুলের সংযোগ কিরূপে ঘটিল? অপর পক্ষে, চক্ষু ও ফুল, এই দুইটিই জড় পদার্থ; ইহাদের সংযোগে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় কি ভাবে?

ইহার উত্তরে বেদান্তী বলেন, অনাদি চৈতন্য বিশ্বপ্রপঞ্চকে উদ্ভাসিত করিতেছে। সেই চৈতন্যের প্রতিফলনে তোমার ও প্রতি জীবের অন্তঃকরণ অর্থাৎ স্বচ্ছ বুদ্ধি উদ্ভাসিত হয়; চৈতন্যের আভাসযুক্ত এই বুদ্ধিই "আমি" অর্থাৎ তোমার ও প্রতি জীবের আত্মা। এই বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া নির্গত হইয়া সর্বত্র প্রসারিত হইতেছে। বৃহৎ সরোবরের জল সরু নালা দিয়া নির্গত হইয়া নিকটবর্তী ক্ষেত্রসকলে প্রবাহিত হয়, এবং ক্ষেত্রের আকার অনুসারে কোথাও গোলাকার কোথাও চতুষ্কোণাকার ধারণ করে; ঐ স্বচ্ছ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহিরে প্রসারিত হইয়া যে বস্তুর সংসর্গে আসে, সেই বস্তুর আকারে পরিণত হয়; এইভাবে পরিণতির নাম অন্তঃকরণের বৃত্তি। অনাদি চৈতন্য কিন্তু সর্বদাই, সর্বত্র, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুকে সতত প্রকাশিত করিতেছে; কিন্তু তোমার কাছে কোন বস্তুই প্রকাশিত হইতে পারে না। বাহিরে যে পদ্মফুল আছে, অনাদি চৈতন্য তাহাকে এবং

তোমাকে, তোমার অজ্ঞাতসারেই যুগপৎ প্রকাশিত করিতেছে ; কিন্তু সেই অনাদি চৈতন্যের আভাসযুক্ত তোমার অন্তঃকরণ, যখন চক্ষু দ্বারা বাহির হইয়া ফুলের আকার ধারণ করে, অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে পরিণত হয়, কেবল তখনই পদ্মফুলটি তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। এইভাবে অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারাই পদ্মফুলের সঙ্গে তোমার সংযোগ হয় এবং "ফুল দেখিতেছি" এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এখানে আপত্তি হইতে পারে, অনাদি চৈতন্য বিশ্বপ্রপঞ্চকে প্রকাশিত করিতেছে, ইহা মানিব কেন? সুরেশ্বরাচার্যের বার্তিক অবলম্বন করিয়া বেদান্তী উত্তর দিতে পারেন—

কার্য্যং সর্ব্বৈর্যতো দৃষ্টং প্রাগভাবপুরঃসরম্।
তস্যাপি সংবিৎ-সাক্ষিত্বাৎ প্রাগভাবো ন সংবিদঃ॥

যেহেতু সকলেই দেখিয়াছেন যে, কার্যবস্তুর প্রাগভাব থাকেই ; আবার সংবিৎই সেই প্রাগভাবের সাক্ষী। সুতরাং সংবিদের প্রাগভাব হইতে পারে না।

যাহা উৎপন্ন হয়, তাহারি নাম কার্যবস্তু। উৎপত্তির পূর্বে বস্তুর অভাবই থাকে ; ইহারই নাম প্রাগভাব। সংবিৎই এই প্রাগভাবের সাক্ষী। সুতরাং সংবিদের প্রাগভাব হইতে পারে না।

তোমার জানালাতে টবে ফুলের গাছ ; তুমি প্রতিদিন লক্ষ্য কর, গাছে কুঁড়ির উদ্গম হইয়াছে কি না ; কিন্তু তুমি দেখিতে পাও না, কারণ কুঁড়ির অভাব। দুইদিন পরে গাছে দুইটী কুঁড়ি দেখিলে, দুই দিন পূর্বে কুঁড়ির অভাব ছিল ; ইহাই প্রাগভাব ; কিন্তু আজ কুঁড়ির উদ্গম হইয়াছে। এই ঘটনার সাক্ষী কে ? উত্তর বলিবে, তুমিই সাক্ষী ; কিন্তু তোমার জড় দেহ প্রাণ মন ইন্দ্রিয় তো সাক্ষী হইতে পারে না ; সুতরাং

মানিতেই হয়, তোমার চৈতন্যই সাক্ষী। এইভাবে স্বীকার করিতে হয়, প্রপঞ্চও ছিল না, পরে সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, প্রপঞ্চের প্রাগভাব ছিল; তাহার সাক্ষী কে? মানিতেই হয় প্রপঞ্চের প্রাগভাবের সাক্ষী চৈতন্য অর্থাৎ সংবিৎ। এই সংবিৎ-এর প্রাগভাব ছিল কিনা এ প্রশ্ন করা চলে না। যদি কর, তবে বলিতে হয়, এই সংবিৎ এর প্রাগভাব-এর সাক্ষী অপর সংবিৎই হইবে, এবং তাহার প্রাগভাব হইতে পারে না। সুতরাং সংবিৎ নিত্য; এই সংবিদের জন্ম নাই সুতরাং বিনাশও নাই; এই নিত্য সংবিৎ অনাদি চৈতন্যই, সুতরাং অনাদি চৈতন্য প্রপঞ্চকে সতত প্রকাশিত করিতেছে; এই অনাদি চৈতন্য নিত্যসংবিৎ, আত্মাই, ব্রহ্মই।

কর্মকারের কর্মশালাতে আগুন জ্বলে; হাপরের বাতাসে আগুন প্রবল হয়, তাহাতে লোহা দগ্ধ হইয়া রক্তবর্ণ হয়; তখন কর্মকার সেই লোহা তুলিয়া নেহাই-এর উপর রাখিয়া হাতুড়ির প্রবল আঘাতে লোহার নানা জিনিষ প্রস্তুত করে। শক্ত-লোহাও এইভাবে নানা আকারে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু যে নেহাই এত আঘাত সহ্য করিতেছে, সে অপরিবর্তিতই থাকে। এই নেহাই-এর নাম কূট।

এই চিরচঞ্চল প্রপঞ্চ যাহাতে অধিষ্ঠিত, সেই অনাদিচৈতন্যও কূটের ন্যায় সতত অপরিবর্তিতভাবে স্থিত থাকেন বলিয়া তাহাকে কূটস্থচৈতন্যও বলা হয়। আবার তিনিই সাক্ষীরূপে স্থিত বলিয়া সাক্ষীচৈতন্য বলিয়াও আখ্যাত হন।

এই কূটস্থচৈতন্যই যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত বিজ্ঞাতা। ইহাকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

চৈতন্যকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না কেন? ইহার উত্তর পাওয়া যায় কেনোপনিষদে; সেই উপনিষদ বলিতেছেন—

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

'লোক যাহাকে মনের দ্বারা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে ব্যাপ্ত করিয়া চালিত করিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞগণ বলেন, তিনিই ব্রহ্ম; কিন্তু লোকে যাহাকে 'ইহা' (ইদং) বলিয়া উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।'

যে চৈতন্যজ্যোতিঃ আত্মারূপে অন্তরে বাহিরে, সর্বত্র সর্ববিষয়ে পরিব্যাপ্ত আছেন, তিনি প্রত্যক্‌চৈতন্য নামে আখ্যাত হন; এই প্রত্যক্‌চৈতন্য, মনকেও ব্যাপ্ত করিয়া আছেন এবং চালিত করিতেছেন। তাহারি পরিচালনায় মন বাহিরে ছুটিয়া যায় এবং বাহ্যবস্তুর সংসর্গে আসিয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপে পরিণত হয়; এই বৃত্তির সাহায্যেই মানুষ বস্তুর জ্ঞান লাভ করে। চৈতন্যের পরিচালনাতেই মনে মননশক্তি উৎপন্ন হয়; সুতরাং মন চৈতন্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সকলও চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া বাহ্যবস্তুর প্রতি ছুটিয়া যায়; কারণ ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃই পরাক্ অর্থাৎ বহির্মুখ, সুতরাং সেগুলি প্রত্যক্‌কে প্রকাশ করিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়সকলই বা বহির্মুখ কেন? আর এই অবস্থায় মানুষ কিরূপে আত্মাকে দর্শন করিতে পারিবে? এই প্রশ্নের উত্তর কঠোপনিষদ ২।১।১ মন্ত্রে পাওয়া যাইবে—

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বম্ ইচ্ছন্॥

স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সকলকে বহির্মুখ করিয়াছেন যেন তাহাদিগকে হিংসা করিবার জন্য; সেইজন্য ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য-বস্তুকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু ধীর স্বভাব জ্ঞানীব্যক্তি চক্ষুকে ফিরাইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্য-বস্তু হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কেন দর্শন করেন? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, অমৃতত্বের ইচ্ছা করিয়াই জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ তপস্যা করেন।

যে মানুষের অন্তরে অমৃতত্বের পিপাসা জাগিয়াছে, তাহাকে সাধনার উপদেশ দিবার জন্যই শ্রুতি এই উক্তি করিয়াছেন।

অন্ধকারময় ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রাত্রিতে যে যাত্রী তরণী হইতে নদীমুখের জলস্রোতে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া যাওয়া কত সহজ। যদি সেই যাত্রী মূর্খ হয়, তবে সে তাহাই করিবে; ইহার ফলে সে স্রোতের টানে বহিঃ-সমুদ্রে গিয়া পড়িবে এবং অতলে তলাইয়া যাইবে; তাহার নিস্তার থাকিবে না। যদি যাত্রী জ্ঞানী হয়, তবে সে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া স্রোতের প্রতিকূলে যাইবার চেষ্টা করিবে, নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়।

অন্ধকারাবৃত ভীষণ মৃত্যুসাগরে পতিত লক্ষ লক্ষ জীব আঘাত পাইতেছে, প্রহৃত হইতেছে, হাবুডুবু খাইতেছে, তবুও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে ভোগের লোভেই ভাসিয়া চলিয়াছে; তাহাদের নিস্তারের আশা নাই। যদি ভাগ্যক্রমে কোন জীবের অন্তরে অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগে, তবে সে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের প্রতিকূলে চলিতে সংগ্রাম করিবে; প্রত্যাহার দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়সকলকে ভোগ্যবস্তুর দিক হইতে ফিরাইয়া আত্মস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে; ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত হইলে,

চিত্ত প্রশান্ত হইলে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হইবে, সে 'নেতি নেতি' আত্মাকে দর্শন করিবে ; সে অমৃতত্ব লাভ করিবে, নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিং। এই অমৃতত্বলাভের পর, জানিবার, পাইবার কিছুই থাকে না। ইহাই কৃতকৃত্যতা।

২

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ একবার মধুকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে, চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে ; একই বিষয়ের দুইবার উল্লেখ কেন ? দুই স্থানের পাঠের মধ্যেও স্থানে স্থানে ভেদ আছে ; তাহাই বা কেন ? ইহার উত্তর দিতে গিয়া ভগবান ভাষ্যকার ব'লিয়াছেন ইহা নিগমন স্থানীয়। বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় উক্তি পুনরুক্তি নহে, বিশেষ কিছু বলার জন্য উপসংহার স্বরূপ। অনুমান প্রমাণের যাহা সিদ্ধান্ত, ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে তাহারি নাম নিগমন (Conclusions) ; কিন্তু আধুনিক তর্কশাস্ত্র ও ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু প্রভেদ আছে ; দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বুঝানো যাইতে পারে। যথা—

আধুনিক—সকল মানুষ মরণশীল (প্রধান যুক্তি বাক্য)
রামও মানুষ (অপ্রধান যুক্তি বাক্য)
সুতরাং রামও মরণশীল (সিদ্ধান্ত বা নিগমন)

ভারতীয়—পর্বতে অগ্নি আছে (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু পর্বতে ধূম আছে (হেতু)
যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানে অগ্নি (ব্যাপ্তি)
যথা রান্নাঘরে উনুন (দৃষ্টান্ত)
সুতরাং পর্বতে অগ্নি আছে (সিদ্ধান্ত বা নিগমন)

আধুনিক দৃষ্টান্তে তিনটি ধাপ এবং 'সকল মানুষ মরণশীল' এ কথার প্রমাণ কি, তাহা বলা হয় নাই। ভারতীয় দৃষ্টান্তে হেতু, ব্যাপ্তি ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ থাকায় প্রতিজ্ঞাত "পর্বতে

"অগ্নি আছে" বাক্যটী সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইয়া সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ নিগমন হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহারই হেতু, ব্যাপ্তি, দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে তাহাই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত বা নিগমনস্বরূপ পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠের সঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠের স্থানে স্থানে যে সামান্য প্রভেদ আছে, তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে পরবর্তী অধ্যায়ের পাঠ স্পষ্টতর ও তাহাদের যুক্তি দৃঢ়তর। কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে :—

(ক) ৪।৫।৬ মন্ত্রে (ন বা অরে পত্যুঃ কামায় ইত্যাদি) পশূনাং কামায়, বেদানাং কামায় এই দুইটীর উল্লেখ আছে ; কিন্তু ২।৪।৫ মন্ত্রে এগুলির উল্লেখ নাই ; সুতরাং পূর্বোক্ত মন্ত্রটী পূর্ণতর।

(খ) ২।৫।১০ মন্ত্রে আছে ঋগ্বেদ প্রভৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি এবং ধর্মবিজ্ঞান ও ধর্মব্যাখ্যানসকল সেই মহাভূতের নিঃশ্বাস স্বরূপ। ৪।৫।১১ মন্ত্রে এ সকলের সঙ্গে যজ্ঞ (ইষ্টং) আহুতি (হুতম্) অন্ন (আশিতম্) পান (পায়িতম্), ইহলোক (অয়ং চ লোকঃ) পরলোক (পরশ্চলোকঃ) সকল প্রাণী (সর্ব্বাণি চ ভূতানি) প্রভৃতিরও পরমাত্মার নিঃশ্বাসস্বরূপ (অস্যমহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্) উল্লেখ আছে। সুতরাং এই মন্ত্র পূর্ণতর এবং স্পষ্টতর।

(গ) ২।৪।১২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, সৈন্ধব লবণের খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার কারণস্বরূপ সেই জলেই পুনরায় বিলীন হয়। তখন সেই খণ্ডকে জল হইতে পৃথক করা যায়

না, যেখান হইতে জল নেওয়া হয়, তাহাতেই লবণ থাকে; তেমনি অনন্ত, অপার, মহদ্ভূত বিজ্ঞানঘনই। ৪।৫।১৩ মন্ত্রে আছে যে লবণখণ্ডের অন্তর নাই, বাহির নাই, তাহা সর্বাংশেই একরস, (অনন্তরঃ, অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘনঃ); তেমনি এই আত্মারও অন্তর নাই, বাহির নাই এবং তাহা সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘনই। অবশিষ্ট অংশ দুইমন্ত্রে একই প্রকার (অয়মাত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব)। এখানে লক্ষণীয় যে পূর্বমন্ত্রের বিজ্ঞানঘনই পর মন্ত্রে প্রজ্ঞানঘন। এখানেও পরবর্তী মন্ত্র পূর্ণতর, দৃঢ়তর।

(ঘ) ২।৪।১৩ মন্ত্রে মৈত্রেয়ী বলিয়াছেন যে তিনি মোহগ্রস্ত হইয়াছেন; উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে তিনি মোহকর কিছুই বলেন নাই; উক্ত মহদ্ভূতকে জানিতে পারা যায়। ৪।৫।১২ মন্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টতরভাবে বলিয়াছেন, এই মহদ্ভূতই আত্মা, ইনি অবিনাশী এবং উচ্ছেদশূন্য (অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা)। সুতরাং এই উক্তি দৃঢ়তর।

(ঙ) ৪।৫ ১৫ মন্ত্রের প্রথমাংশ "যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যাদি অংশ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ২।৪।১৪ মন্ত্রের অতিরিক্ত যে অংশ এখানে আছে, তাহা এই :—স এস নেতি আত্মাগৃহ্যো নহিগৃহ্যতেঽশীর্য্যা নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্জতেঽসিতো নহি ব্যথতে বিজ্ঞাতারম অরে কেন বিজানীয়াৎ ইতি উক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি, এতাবৎ অরে, অমৃতত্বম্। ইতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার।" বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ এই অংশটুকুও পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

অবশিষ্ট অংশের অর্থ এই,—এই সেই নেতি নেতি আত্মা; ইনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হন না, কারণ ইন্দ্রিয় ইহাকে গ্রহণ

করিতে সমর্থ নহে। ইনি শীর্য হওয়ার যোগ্য নহেন, তাই শীর্য হন না। ইনি অসঙ্গ, তাই সক্ত হন না। ইনি অক্ষীণ, তাই ব্যথা প্রাপ্ত হন না বিকৃত হন না। হে মৈত্রেয়ী, তুমি উপদেশ প্রাপ্ত হইলে। এই পর্যন্ত, অর্থাৎ নেতি নেতি আত্মা ইহাই অমৃতত্ব।

ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ সমাপ্ত হইল। নেতি নেতি আত্মা, ইহাই অমৃতত্ব। ইহার অতিরিক্ত অমৃতত্ব কিছুই নাই। এই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, সুতরাং অমৃতত্ব লাভ হয়।

অমৃতত্বের আলোচনা সমাপ্ত হইল। কেহ বলিতে পারেন, দুরূহ "নেতি নেতি আত্মা"র সন্ধান না করিলে কি ক্ষতি? আচার্য শঙ্করের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

একটি শুষ্ক অলাবু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল, তরঙ্গ তাহাকে অহরহ তুলিতেছে ফেলিতেছে, বার বার প্রহার করিতেছে। একবার অলাবু তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইল, কিন্তু তরঙ্গ খণ্ডগুলিকে টানিয়া নিল; পুনরায় তরঙ্গ খণ্ডগুলিকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিল, সেগুলি আরো খণ্ডিত হইল, কিন্তু তরঙ্গ টানিয়া নিল। দেহাদির সহিত সংহত চৈতন্যরূপী আত্মা এইরূপে মৃত্যু-সাগরে পড়িয়া আঘাতের পর আঘাত পাইতেছে, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের চক্রে আবর্তিত হইতেছে; তাহার যন্ত্রণার বিরাম নাই, নিস্তার নাই। যদি জীব কোনদিন এই যন্ত্রণা সম্বন্ধে সচেতন হয়, তবে সে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়; তখন এই নেতি নেতি আত্মার সন্ধান করিতেই হয়; কারণ এই আত্মাই অমৃতত্ব, মুক্তি।

৩

'যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ' এই মন্ত্রাংশটি ঋগ্‌বেদীয় কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় হইতে গৃহীত। ইহা ইন্দ্র কর্তৃক রাজা প্রতর্দনকে প্রদত্ত উপদেশের অংশ। এখানে প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ, ব্রহ্মচৈতন্যের আভাসে অর্থাৎ প্রতিফলনে উজ্জ্বল বুদ্ধি। এই উজ্জ্বল বুদ্ধিতেই "আমি" বোধ উদ্ভূত হয় এবং এই 'আমি'ই জীবাত্মা বলিয়া গণ্য হয়। (অত্র প্রজ্ঞাপদেন সাভাসা জীবাখ্যা বুদ্ধিরুচ্যতে—রত্নপ্রভা ব্রঃ সূঃ ১।১।৩১)। প্রাণ শব্দ বলবাচক, প্রজ্ঞা শব্দ জ্ঞানবাচক; প্রাণ শব্দ ক্রিয়াশক্তির বোধক, প্রজ্ঞা শব্দ জ্ঞানশক্তির বোধক। সুতরাং মন্ত্রটীর অর্থ জীবাত্মার যে ক্রিয়াশক্তি তাহা জ্ঞানশক্তিই, এবং যাহা জ্ঞানশক্তি তাহা ক্রিয়াশক্তিই; অর্থাৎ উভয়ে একই শক্তি। উপনিষদ বহু যুক্তি দ্বারা এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। এইগুলির সাহায্যে আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

উপনিষদ বলিতেছেন, প্রাণ ও প্রজ্ঞা এই শরীরে এক সঙ্গে বাস করে এবং এক সঙ্গেই উৎক্রান্ত হয়। একই প্রাণ জাগ্রৎ-কালে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পাঁচ অবয়বে স্থিত হয়; কিন্তু পুরুষ যখন সুপ্ত হয় এবং স্বপ্ন দেখে না, তখন ইন্দ্রিয়সকলের জ্ঞান ও কর্ম রুদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু তখন প্রাণই এক হইয়া স্থিত থাকে। তখন বাগিন্দ্রিয়সকল নামের সহিত, চক্ষুসকল রূপের সহিত, কর্ণ শব্দের সহিত, মনঃসকল ধ্যানের (চিন্তার) সহিত প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। যখন পুরুষ পুনরায় জাগিয়া উঠে, তখন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ বিস্ফুলিঙ্গসকলের ন্যায় প্রাণও বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ অবয়বে চলিয়া যায়; প্রাণ হইতে

ইন্দ্রিয়সকল এবং তাহাদের দ্বারা অপর বস্তুসকল প্রকাশিত হয়। মৃত্যুকালে পুরুষ যখন দুর্বল হইয়া অচেতন হয়, তখন সে দেখে না, শুনে না; কারণ তখন প্রাণ একীভূত হয়, এবং বাক্ নামের সহিত, চক্ষুঃ রূপের সহিত, কর্ণ শব্দের সহিত এবং মনঃ ধ্যানের সহিত প্রাণে লয় পাইতে থাকে; যখন প্রাণ এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন এই সকলের সহিতই উৎক্রান্ত হয়; তখন বাক্ সকল নামকে, চক্ষুঃ সকল রূপকে, কর্ণ সকল শব্দকে,, মনঃ সকল চিন্তাকে বিসর্জন দেয়। এইরূপে সব কিছুই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। এইভাবে প্রজ্ঞা প্রাণে এক হয়।

এখন, সকল ভূত প্রজ্ঞাতে কিরূপে এক হয় তাহা বলা হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে চিদাভাসযুক্ত, অর্থাৎ ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রতিফলনে উজ্জ্বল বুদ্ধিই প্রজ্ঞা, তাহাই তথাকথিত জীবাত্মা। সেই জীবাত্মা জগৎ-প্রপঞ্চকে দেখিতেছে, শুনিতেছে জ্ঞানগোচর করিতেছে; সুতরাং প্রপঞ্চের দুই ভাগ,—এক ভাগ ভৌতিক অপর ভাগ প্রজ্ঞাত্মক, প্রজ্ঞাই ভৌতিক অংশকে প্রকাশ করিতেছে; প্রজ্ঞা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি করে। উপনিষদ এই ভৌতিক অংশকে দশভূতমাত্রা প্রজ্ঞা আখ্যা দিয়াছেন। প্রজ্ঞাত্মক অংশের নাম দশপ্রজ্ঞামাত্রা। উপনিষদ বলিয়াছেন, দশভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রাতে অধিষ্ঠিত, দশ প্রজ্ঞামাত্রা ভূতমাত্রাতে অধিষ্ঠিত। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকে ভূতমাত্রা থাকে না; ইহাদের কোনও একটীর দ্বারা কিছুই সিদ্ধ হয় না; ইহারা পৃথক্ পৃথক্ নহে। (তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞম্, দশপ্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতম, যদ্ধি ভূতমাত্রাঃ ন স্যু র্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ ন স্যুঃ, যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যু র্ন ভূতমাত্রা স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো ন এতন্নানা।)

এখানে বক্তব্য এই, আচার্য বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ পদার্থ, এবং ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতই দশ ভূতমাত্রা। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন এবং আঘ্রাণ এই পঞ্চপ্রকার জ্ঞান ইহাই দশ প্রজ্ঞামাত্রা। (পঞ্চ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ ইতি দশ ভূত-মাত্রাঃ ; পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি পঞ্চ বুদ্ধয়ঃ ইতি দশ প্রজ্ঞামাত্রাঃ—ভামতী ১।১।৩১ সূঃ)। অন্যান্য আচার্যেরাও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কৌষীতকিতে যে বর্ণনা আছে, তাহা কিঞ্চিৎ ভিন্ন, উপনিষদে বর্ণিত ভূতমাত্রার নাম এই প্রকার।

প্রজ্ঞামাত্রা		ভূতমাত্রা
বাক	...	নাম
নাসিকা	...	গন্ধ
চক্ষুঃ	...	রূপ
শ্রোত্র	...	শব্দ
জিহ্বা	...	অন্নরসঃ
হস্ত	...	কর্ম
শরীর	...	সুখদুঃখ
উপস্থ	...	আনন্দ, রতি, প্রজাতি
পাদ	...	ইত্যা (চলন)
প্রজ্ঞা (মন)	...	কাম

শরীরকে ত্বক্‌ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু পায়ু ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ নাই। এই সকল প্রভেদ সত্ত্বেও বাচস্পতির ব্যাখ্যাই সর্বজনগ্রাহ্য। আধুনিক কালের বিচারেও জগৎপ্রপঞ্চ প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রার অতিরিক্ত কিছুই নহে। আধুনিক

বিচারেও প্রপঞ্চকে বিশ্লেষণ করিলে, জ্ঞেয় বস্তু (objects of senses, ভূতমাত্রা) এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান (senses and sense perceptions, প্রজ্ঞামাত্রা)-এর অতিরিক্ত কিছুই নহে। আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে কর্ণবিদারী শব্দ হইল, বহু গৃহ পড়িয়া গেল, অগ্নি বহু গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল, বহু মনুষ্য হত হইল। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহার কাছে শব্দ, ভগ্ন গৃহ জ্বলন্ত অগ্নি, শবদেহ এই সব জ্ঞেয়বস্তু ভিন্ন কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিক রকেট চন্দ্রের অভিমুখে ছুটিয়া চলিতেছে, বিচার করিলে তাহা শব্দ এবং রকেটের স্থানপরিবর্তন অর্থাৎ চলন ব্যতীত কিছুই নহে, দুইই ভূতমাত্রা এবং কর্ণ ও পদস্থানীয় বেগই প্রজ্ঞামাত্র।

প্রাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। কিন্তু এই প্রাণ কি বস্তু? ইহার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। প্রাণ কি বায়ুবিশেষ? অথবা দেবতাবিশেষ? অথবা অন্য কিছু? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে উপনিষদের নিকটই যাইতে হইবে।

উপনিষদ বলিয়াছেন, দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ করিয়া এবং পৌরুষ দেখাইয়া ইন্দ্রের প্রিয় হইলেন এবং তাঁহার ধামে গেলেন। প্রসন্ন ইন্দ্র তাহাকে বর চাহিতে বলিলেন। ধীরবুদ্ধি প্রতর্দন বলিলেন মানুষের জন্য যে বর কল্যাণতম সেই বরই আমাকে দাও। ইন্দ্র বলিলেন "আমাকে তুমি জান। এই বরই মানুষের কল্যাণতম মনে করি।" ইন্দ্র পুনরায় বলিলেন "আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমিই প্রাণ; আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা কর।" তারপর প্রাণ ও প্রজ্ঞার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া পুনরায় বলিলেন "এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত; ইনিই লোকপাল, ইনিই লোকাধিপতি, ইনিই সর্বেশ্বর; ইনিই আমার আত্মা, ইনিই আমার আত্মা।"

উপনিষদের এই অংশ গুরুত্বপূর্ণ। যাহারা বেদান্ত চর্চা করেন তাহারা জানেন, উপনিষদের ব্রহ্মবাচক বাক্যগুলির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। কৌষিতকীর উল্লিখিত অংশের অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রে চারিটী সূত্র (১ম অধ্যায় ১ম পাদ সূত্র ২৮-৩১ পর্যন্ত) রচিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ব্রহ্মসূত্রের চারিটী অধ্যায় আছে; প্রতি অধ্যায় চারিটী পাদে বিভক্ত; এই ষোলটী পাদ একশত

বিরনব্বইটী অধিকরণে বিভক্ত ; অধিকরণ (section) শব্দের অর্থ বিচার্য বিষয় ও তার মীমাংসা, সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে একশত বিরনব্বইটী প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসা করা হইয়াছে।

এই আলোচ্য অংশ অবলম্বনে যে চারিটী সূত্র রচিত হইয়াছে, সেগুলির আলোচনা করা হইতেছে :—

১ম অধ্যায় ১ম পাদ ২৮ সূত্র :—'প্রাণস্তথানুগমাৎ'। ইহার অর্থ, এই অধিকরণে উক্ত প্রাণ, ব্রহ্মই ; পূর্বাপর বাক্যসকলের আলোচনা করিলে ইহাই নিশ্চিত হয়। ইন্দ্র প্রতর্দনকে মানুষের যাহা কল্যাণতম, সেই বর দিবার জন্য বলিলেন "আমিই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ ; আমাকে জান ; ইহাই কল্যাণতম মনে করি, আমাকে উপাসনা কর ; এই প্রাণ আনন্দ অজর অমর ; ইহাই আমার আত্মা।" ইন্দ্র যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাদের কোন কোন কথা ইন্দ্রকেই বুঝায় ; অপর কোন কোন কথা প্রাণ-বায়ুকে বুঝায়, কিন্তু পূর্বাপর সকল কথার আলোচনায় বুঝা যায়, ইন্দ্র প্রতর্দনকে ব্রহ্মতত্ত্বেরই উপদেশ দিয়াছেন ; কারণ তাহাই মানুষের পক্ষে কল্যাণতম।

২৯শ সূত্র—'ন বক্তুরাত্মোপদেশাৎ ইতিচেৎ,
অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হি অস্মিন'।

যদি আপত্তি কর যে প্রাণ ব্রহ্ম হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্র বলিয়াছেন "আমি প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণ, আমাকে জান" ; ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে বিগ্রহবান দেবতা ইন্দ্র, "আমি" পদের দ্বারা বক্তা নিজেকেই বুঝাইয়াছেন, তবে তাহা নহে ; কারণ ইন্দ্রের উক্তিতে এমন বহু বাক্য আছে, যাহা শুধু ব্রহ্মেই প্রয়োগ করা যায়। 'স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ' বাক্যটি ব্রহ্মকেই বুঝায়, অন্য কাহাকেও নহে।

৩০শ সূত্র :—'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ বামদেববৎ'। বক্তা ইন্দ্র তাহা হইলে "আমি, আমাকে" এই ভাবে উপদেশ দিলেন কেন? এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে যে দেবরাজ ইন্দ্র "আমি পরব্রহ্ম" এই জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া পরমাত্মারূপেই "আমি" বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্বে ঋষি বামদেবও এই জ্ঞান লাভ করিয়াই বলিয়াছিলেন "আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য হইয়াছিলাম।" গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ এই পরমাত্মারূপেই বলিয়াছিলেন "আমি তোমাকে মুক্ত করিব, এক আমারই শরণ লও" ইত্যাদি।

ভারতীয় জনগণকে আধুনিক এক ভারতীয় ভাষায় উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি, যিনি সর্বপ্রথম বুঝাইয়াছিলেন, এ সকলের বিবরণ লিখিয়াছিলেন, মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি আচার্য রামমোহন রায়; তিনি এই "প্রতর্দন" অধিকরণের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উপযোগী মনে হওয়াতে এইখানে উদ্ধৃত করা হইল। আচার্য রামমোহন লিখিয়াছেন—আত্মবিদ্যার উপদেশ কালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা স্বরূপ আপনাকে বর্ণনা করেন, অথচ উপাধি সম্বন্ধাধীন হইয়া পুনরায় স্থানে স্থানে ভেদ প্রদর্শন করিয়াও আপনাকে কহেন, অর্থাৎ পরমাত্মাকে অন্যরূপে এবং আপনাকে পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করেন; অতএব অধ্যাত্ম উপদেশে পরমাত্মা স্বরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষে তাৎপর্য না হইয়া পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হয়েন। কৌষীতকি উপনিষদে ইন্দ্র আপনাকে পরব্রহ্ম স্বরূপে উপদেশ করেন, "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতম্ ইত্যুপাসস্ব", "জ্ঞানস্বরূপ জীবনদাতা ও মরণশূন্য

যে ব্রহ্ম, তাহা আমি হই, আমার উপাসনা করহ"; "মামেব বিজানীহি", "কেবল আমাকেই জান।" এ সকল শ্রুতি পরব্রহ্মের বিশেষণই বলিতেছেন; কিন্তু ইন্দ্র এ সকল শ্রুতির বক্তা, অতএব এ সকলের দ্বারা ইন্দ্রের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয়, এই আশঙ্কায় পরের সূত্রে কহিতেছেন—(৩০ সূত্র) শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশঃ বামদেববৎ। ইন্দ্র এস্থলে "আমি ব্রহ্ম" এই শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা নিজকে পরব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়া কহিয়াছেন "আমাকেই কেবল জান, আমার উপাসনা কর, যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন 'আমিই মনু হইয়াছিলাম, সূর্য হইয়াছিলাম'।" কিন্তু এই অধ্যাত্ম উপদেশের সঙ্গে আপনাকে উপাধির বশে ভেদদৃষ্টিতেও বর্ণনা ক'রয়াছেন "আমি ত্রিশীর্ষাকে বধ করিয়াছিলাম; বৃত্রাসুরের জোষ্ঠ ভ্রাতার নাম ত্রিশীর্ষা। অর্থাৎ এরূপ ক্রুর কার্য করিয়াও আত্মজ্ঞান বলে আমার কোন হানি হয় নাই।" বস্তুতঃ ঐ সকল পরমাত্মপ্রতিপাদক শ্রুতির বক্তা ইন্দ্র, অথচ তাহাতে পরিচ্ছিন্ন (দেহধারী) ইন্দ্রের সাক্ষাৎ পরমাত্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরেই তাৎপর্য হয়। সেইরূপ ভগবান্ কপিলও অধ্যাত্ম উপদেশে কহিতেছেন:

বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে॥

(ভাগবতম্, ৩য় স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়)

অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বস্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তিদ্বারা ভজনা করে, তাহাকে আমি সংসার হইতে ত্রাণ করি।

এস্থলে ভগবান কপিল পরমাত্মা স্বরূপে বর্ণনা করিতেছেন,

কিন্তু এর তাৎপর্য এই নহে যে, অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ ব্যক্তিরূপী অর্থাৎ হস্তপাদাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে কপিল, তাহার মূর্তির উপাসনা করিবে। পুনরায়, উপাধিসম্বন্ধদ্বারা এই উপদেশের মধ্যে আপন দৈহিক বিশেষণও বলিয়াছেন "হে মাতঃ, ইহলোকেই স্বর্গ-নরকের চিহ্ন হয় (অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে)।" এই মীমাংসা তাবৎ অধ্যাত্ম উপদেশে ঋষিরা ও আচার্যেরা করিয়াছেন।

প্রতর্দন অধিকরণের ৩১ সূত্র :—"জীব-মুখপ্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতিচেৎ ন উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্‌যোগাৎ। এই অধিকরণে প্রাণবোধক শব্দ আছে; জীব অর্থাৎ দেবতা ইন্দ্রের বোধক শব্দও আছে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মবোধক নহে; যদি এই রূপ আপত্তি হয়; তবে বক্তব্য এই যে তাহা সঙ্গত নহে কারণ এখানে উপাসনার উপদেশও আছে। তাহাতে জীব-উপাসনা, প্রাণোপাসনা এবং ব্রহ্মোপাসনা—এই তিন প্রকার উপাসনা স্বীকার করিতে হয়; তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ পূর্বে ২৩নং সূত্রে প্রাণ ব্রহ্মই, একথা স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং এখানেও প্রাণ শব্দের ব্রহ্ম অর্থই স্বীকার করিতে হইবে। অথবা এখানে অন্য অর্থও স্বীকার করা যায়। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও বিভিন্ন উপাধিযোগে ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকার উপাসনা হইতে পারে। এখানেও প্রাণধর্ম অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি এবং জীবধর্ম অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি এই উপাধিদ্বয়-যোগে ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা হইতে পারে, আবার ব্রহ্মের নিজ ধর্মের দ্বারাও উপাসনা হয়। এখানে আচার্য রামমোহন বলিতেছেন যে তিন প্রকার উপাসনা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইল, এমত কহিতে পারিবে না; যেহেতু জীব আর মুখ্যপ্রাণ, এই দুই

অধ্যাসরূপে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়েন, আর সেই ব্রহ্মের ধর্মের সংযোগ রাখেন ; যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প, পৃথক্ উপলব্ধ হইয়াও রজ্জুর আশ্রিত হয়, আর রজ্জুর ধর্মও রাখে, অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে সর্পের উপলব্ধি আর থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়াই অধ্যাস। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন "একই ব্রহ্ম উপাধিসম্বন্ধযোগে উপাস্য এবং সমস্ত উপাধিসম্বন্ধবর্জ্জিত রূপে জ্ঞেয় হয়েন ইহাই বেদান্তের উপদেশ"। (একমপি ব্রহ্ম অপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধং চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপদিশ্যতে (ব্রঃ সূঃ ১।১।৬)। উপাধিযুক্ত হইলেই অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম জন্মে।

অমৃতত্ত্ব সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশের আলোচনা পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে ; সেই প্রসঙ্গে একায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও কর্মসকলও আত্মাতে বিলীন হয়, যেহেতু প্রাণ ও প্রজ্ঞা একই, এই উক্তির উপলব্ধির জন্য কৌষীতকি উপনিষদের বাক্য সকলের এবং তদুপরি ব্রহ্মসূত্র সকলের বিস্তৃত আলোচনাও সমাপ্ত হইল !

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদের উপরও চারিটী ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে; সেই গুলির আলোচনাও প্রয়োজনীয় (১ম অধ্যায় ৪ পাদ, সূত্র ১৯-২২)। এই অধিকরণের নাম বাক্যান্বয়াধিকরণ। ইহাতে যে সংশয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে তাহা এই;—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন "পতির প্রয়োজনে পতি জায়ার প্রিয় হয় না, জায়ার নিজ প্রয়োজনে পতি জায়ার প্রিয় হয়", এবং শেষে বলিলেন "সকলের প্রয়োজনে সকল প্রিয় হয় না, নিজের প্রয়োজনে (আত্মনস্তু কামায়) সকল প্রিয় হয়" এবং তারপরেই বলিলেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"। পতি, পত্নী, ধন, ভোগ্য বস্তুসকল জীবাত্মারই প্রিয় হয়; সুতরাং এই স্থলে উপনিষদ যে আত্মার কথা বলিয়াছেন, তাহা জীবাত্মাই; এবং যে আত্মাকে দ্রষ্টব্য বলিয়াছেন তাহাও জীবাত্মাই; যাহাকে বিজ্ঞানঘন বলা হইয়াছে, তাহাও জীবাত্মাই। এই সংশয়ের মীমাংসার জন্যই বলা হইল "বাক্যান্বয়াৎ" ১৯ সূত্র ১ম অধ্যায় ৪র্থ পাদ)। সূত্রের অর্থ এই যে, বাক্যসকলের পূর্বাপর বিচার করিলে বুঝা যায়, এখানে পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে; পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অমৃতত্বের উপদেশ চাহিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিয়াছিলেন, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। পরমাত্মার জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভ হয়, দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং একায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে তিনি মৈত্রেয়ীকে বুঝাইয়াছিলেন যে, সকল বাহ্য বস্তু, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এবং অন্তঃকরণ সহ সমগ্র প্রপঞ্চও আত্মা হইতে অতিরিক্ত

নহে, এ সকলই আত্মাতেই লীন হয়। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য পরমাত্মারই উপদেশ দিয়াছিলেন ; পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী তিনটী সূত্রের আলোচনা এক সঙ্গে করাই উচিত। সূত্রগুলি এইরূপ—

১।৪।২০ সূত্র—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গম্ আশ্মরথ্য—প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির সূচক রূপে জীবাত্মাই এখানে বর্ণিত হইয়াছেন, আচার্য আশ্মরথ্যের ইহাই মত।

১।৪।২১ সূত্র—উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাৎ ইতি ঔড়ুলোমি—জীব উৎক্রান্ত হইবে এইজন্য এখানে জীবাত্মাই বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা আচার্য ঔড়ুলোমির মত।

১।৪।২২ সূত্র—অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ—পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে অবস্থিত ; ইহাই আচার্য কাশকৃৎস্নের মত।

বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। জীবাত্মাসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববর্তী আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি এবং কাশকৃৎস্নের বিভিন্ন মত বেদব্যাস এখানে উল্লেখ করিয়াছেন ; আরো বুঝিতে হইবে যে পরে অন্য কোন মতের উল্লেখ না থাকায়, শেষ মত অর্থাৎ কাশকৃৎস্নের মতই বেদব্যাসেরও অভিমত। সূত্র রচনার পদ্ধতি হইতেই ইহা জানা যায়।

আশ্মরথ্যের মতের ব্যাখ্যা এই :—শ্রুতির প্রতিজ্ঞা এই যে, আত্মা বিদিত হইলে সবই বিদিত হয় ; এই যাহা কিছু আছে, সবই আত্মা। একায়ন প্রক্রিয়াদ্বারা প্রমাণিত করা হইয়াছে যে, নাম-রূপ-কর্মাত্মক এই প্রপঞ্চ এক আত্মা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আত্মাতেই প্রপঞ্চ লীন হয়। দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে কার্যবস্তু কারণ হইতে কোন প্রকারেই অতিরিক্ত নহে। শ্রুতি আরো বলিয়াছেন, পতি, জায়া, বিত্ত

প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু প্রিয় হয়। এই প্রিয় শব্দের প্রয়োগ বুঝাইতেছে যে, যার প্রিয় হয়, সে জীবাত্মা; সুতরাং আত্মা দ্রষ্টব্যঃ এই বাক্যেও জীবাত্মাকেই দেখিতে হইবে, এই উপদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলে, পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার জ্ঞান অসম্ভব হয়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "এই অনন্ত, অপার, মহদ্‌ভূত বিজ্ঞানঘনই এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া ইহাদের সঙ্গে অনুবিনাশ প্রাপ্ত হয়।" (ইদং মহদ্‌ভূতম্ অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যন্তি)। এই শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, ভূতসকল হইতে উত্থিত জীবাত্মাও পরমাত্মাই। আরো বুঝা যায় যে পরমাত্মা কারণ এবং জীবাত্মা তাহা হইতে উৎপন্ন কার্য; সুতরাং উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ। যেহেতু পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক, সেইজন্য পরমাত্মার জ্ঞানেই জীবাত্মাও জ্ঞাত হয়। এইভাবেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয়।

ঔডুলোমির মতের ব্যাখ্যা এইরূপ—জীব উৎক্রান্ত হইবে এবং তখন পরমাত্মাই হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন "এই সংপ্রসন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত জীবাত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পর-জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে)। ইহার তাৎপর্য এই যে, জীব যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতির সহিত সংবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ সে কলুষিত; উপাসনা, ধ্যান করিতে করিতে তাহার কলুষ দূর হইলে, সে স্বচ্ছ হয়, জ্যোতিঃস্বরূপ হয় এবং ইহাই তাহার স্বরূপ। সুতরাং জীবরূপে পরমাত্মার সহিত ভেদ থাকে, কিন্তু পরে অভেদ হয়। ভেদের কারণ নাম ও রূপ, শ্রুতিতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে ;

নদীসকল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়; তখন তাহাদের বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন রূপ থাকে, কিন্তু যে মুহূর্তে নদীসকল সমুদ্রে পতিত হয়, সেই মুহূর্তে তাহাদের পৃথক পৃথক নামরূপ পরিত্যক্ত হয়, বিদ্বান ব্যক্তিও তেমনি নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন। এই উদাহরণে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বুঝা যায়। আরো বুঝা যায় যে নাম ও রূপ জীবেই সংশ্লিষ্ট।

কাশকৃৎস্নের মতে অবিকৃত পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন "এই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করিয়া ব্যাকৃত করিব" (অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি)। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আত্মাই সৃষ্টিতে জীবরূপে অনুপ্রবেশ করেন এবং নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করেন। ইহাতে আরো বলা যায়, জীব সৃষ্ট পদার্থ নহে। আকাশাদি পদার্থের সৃষ্টির ন্যায় জীবাত্মারও সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কথা কোনও শ্রুতিতে নাই। পরমাত্মা জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করিলেন কি প্রকারে? গলার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করানো যায়, ইহা অনুপ্রবেশ; কিন্তু আত্মার এরূপ অনুপ্রবেশ অসম্ভব। কোন কোন প্রস্তর ভাঙ্গলে দেখা যায়, তাহার ভিতর মৃতসর্প প্রস্তরীভূত হইয়া আছে। কিন্তু এই প্রকার অনুপ্রবেশও আত্মার পক্ষে সম্ভব নহে। জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব যেরূপ প্রবিষ্ট হয়, প্রপঞ্চে আত্মার অনুপ্রবেশও সেইপ্রকার। উৎপত্তির পূর্বে আত্মার উপলব্ধি হয় না। পরে কার্য উৎপন্ন হইলে সৃষ্টিতে যখন বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তখন সেই স্বচ্ছ বুদ্ধিতেই আত্মজ্যোতিঃর প্রতিফলন হয়। এইভাবে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বরূপে আত্মার উপলব্ধি হয়। সুতরাং আত্মাই নিত্য, জীবাত্মা কল্পিতমাত্র।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে ভারতীয় ব্রহ্মসাধনাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার তিনপ্রকার সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে,—(১) অভেদ সম্বন্ধ ; (২) কার্যকারণ সম্বন্ধ ; (৩) ভেদাভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু এই তিন প্রকার সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে একই প্রকার—ব্রহ্ম সর্বত্র এক, বিজ্ঞানঘন। অভেদবাদে জীবের উপাধি অবিদ্যা ; তাই জীব নিজেকে পৃথক মনে করে ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দগ্ধ হইলে ব্রহ্মই থাকেন। কার্যকারণ সম্বন্ধে জীব কার্য, ব্রহ্ম কারণ : কার্য কারণ হইতে কখনই অতিরিক্ত নহে ; তাছাড়া কার্যবস্তু নষ্ট হইয়াই থাকে, সুতরাং ব্রহ্মই এক নিত্য।

যেখানে দুই বস্তুর মধ্যে জাতি ব্যক্তি বা কার্য-কারণ বা গুণ-গুণী বা বিশেষ্য-বিশেষণ বা অংশ-অংশী এই পাঁচপ্রকার সম্বন্ধের কোন একটী সম্বন্ধ থাকে, সেখানে ভেদাভেদ সম্বন্ধ হয়। কোন বস্তুর সহিত পরমাত্মার এই রূপ কোনও সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ তাহাও যথার্থ সম্বন্ধ নহে। কিন্তু আশ্মরথ্য এই সম্বন্ধই স্বীকার করিয়াছেন মনে হয় ; তাই স্বীকার করিতে হয় যে ভূতসকলের সংযোগ হইতেই জীবাত্মার উত্থান অর্থাৎ উৎপত্তি ; কিন্তু ভূতসকল বিলীন হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞানঘন পরমাত্মাই থাকেন।

সুতরাং ভারতীয় ব্রহ্মসাধনাতে বিজ্ঞানঘন, অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, আত্মাই একমাত্র সত্য। শ্রুতি ইহার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা যুক্তিদ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত এবং সাধকদের

অনুভবের দ্বারা প্রমাণিত। আচার্য বাচস্পতি মিশ্র নবম শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে এই তত্ত্ব প্রচার করেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আচার্য রামমোহন বাংলা দেশে ইহা প্রচার করেন। দীর্ঘ সহস্র বৎসরের মধ্যে পূর্বভারতে এই তত্ত্ব আর প্রচারিত হয় নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদের উপরে রচিত ব্রহ্মসূত্রগুলির আলোচনা করা হইল। দেখা গেল যে বিজ্ঞানঘন আত্মাই একমাত্র সত্য; ইনিই "নেতি নেতি" আত্মা; এই আত্মাই অমৃতত্ব। ইহার অতিরিক্ত অমৃতত্ব নাই।

এইখানে কেহ বলিতে পারেন, পরাক্রান্ত শত্রু আমার নিরস্ত্র লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে হত্যা করিতেছে, লুণ্ঠন করিতেছে, সশস্ত্র আক্রমণ করিয়া দেশকে শত্রুমুক্ত করাই আমার কর্তব্য; অমৃতত্ব নিয়া আমি কি করিব? কিংবা কোন জনদরদী বলিতে পারেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন, খাদ্য দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষাই কর্তব্য; অমৃতত্ব নিয়া কি করিব? উত্তরে বলা যায়, যাহারা দেশপ্রেমিক, বীর বা জনদরদী সেবাব্রতী, তাহারা নমস্য। কিন্তু তাহারা যাহা বলিতেছেন, তাহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, মানুষ জন্মমরণের চক্রে নিষ্পিষ্ট হইতেছে; শত্রু বধ করিয়া দেশোদ্ধার কর্তব্য; অন্নদানের দ্বারা অনশন মৃত্যু হইতে মানুষকে রক্ষাও কর্তব্য; শত্রু মিত্র নির্বিশেষে প্রতি মানুষকে জন্ম মরণের চক্র হইতে মুক্ত করা পবিত্রতর কর্তব্য নহে কি? যিনি নিজে অমৃতত্বের উপলব্ধি করিলেন না, তিনি অমৃতত্বের সন্ধান দিতে পারেন কি? শাক্য বংশের তরুণ যুবক নগরের পথের ধারে দেখিলেন এক রোগগ্রস্ত, এক জরাজীর্ণ এবং এক মৃতকে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রোগ, জরা এবং

মৃত্যু প্রতি মানুষের, এমনকি তাহার নিজেরও সুনিশ্চিত। শাক্যকুমার বিচলিত হইলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া তীব্র তপস্যায় রত হইলেন, এবং নির্বাণ নিজে উপলব্ধি করিয়া সকল মানুষকে নির্বাণের বাণী শুনাইলেন, সহস্র সহস্র মানুষ সেই বাণীতে সাড়া দিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিল, মুক্ত হইল। যাহারা জনদরদী, নিজে অমৃতত্ব লাভ করিয়া, দুঃখী মানুষকে সেই অমৃতত্বের সন্ধান দেওয়া তো তাহাদেরই কর্তব্য!

পণ্ডিতবন্ধু বলিতে পারেন, আত্মাই যদি অমৃতত্ব, তবে স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু আত্মা আছেন, সেই হেতুই তিনি সত্তাবান্ অর্থাৎ বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট, সুতরাং নেতি নেতি আত্মা কিরূপে সম্ভব হয়? আরো, আত্মার সত্তা কি প্রকার, এবং আত্মার স্বরূপই বা কি প্রকার? উত্তরে বলা যায়, মানুষের ভাষা দুর্বল; আত্মা আছেন এই বলা ছাড়া আত্মাকে বুঝাইবার অন্য উপায় আছে কি? শ্রুতিও বলিয়াছেন "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে", আত্মা আছেন, এই বলা ছাড়া তাহাকে বুঝাইবার অন্য উপায় আছে কি? সুতরাং সত্তা আত্মার বিশেষণ হইতে পারে না।

প্রাঙ্গণের কোণে অগ্নি জ্বলিতেছে; তাহা জ্বলিতেছে এক নির্দিষ্ট দেশে এবং নির্দিষ্ট কালে; সুতরাং এই অগ্নির সত্তা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য; এবং অগ্নির স্বরূপ উজ্জলতা ও উষ্ণতা। এই দৃষ্টান্তে সত্তা ও স্বরূপ পৃথকই হইল; কারণ বস্তুটী দেশের ও কালের অধীনে। যে বস্তুতে দেশ হারাইয়া যায়, কাল স্তব্ধ হয়, সেই বস্তুর সত্তা ও স্বরূপ পৃথক্ হওয়া সম্ভব নহে। এজন্যই বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—অবাধিতা স্বয়ংপ্রকাশতা এব অস্য সত্তা, সা এব স্বরূপম্ অস্য চিদাত্মনঃ (অধ্যাস ভাষ্য), অবাধিত স্বয়ংপ্রকাশতাই চিৎস্বরূপ আত্মার সত্তা, ইহাই আত্মার স্বরূপ। এই স্বয়ংপ্রকাশতা কখনও, কোনদেশে বা কোন কালে বা কোন অবস্থায় বাধা প্রাপ্ত হয় না। এই আত্মা কল্পের আদিতে প্রকাশবান ছিলেন, কল্পের শেষেও প্রকাশবান থাকিবেন এবং এই মুহূর্তেও সমভাবেই প্রকাশবান আছেন। এই স্বপ্রকাশ আত্মাই অমৃতত্ব। ইহাই নেতি নেতি আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদের শেষবাক্য "ইতিহোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার।" যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই নেতি নেতি আত্মার উপদেশ দিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। এই বাক্যের তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আর্যজাতির জীবনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক। প্রত্যেক আর্যের জীবনকাল চারিভাগে বিভক্ত ছিল। আর্য-বালক উপনয়নের পরেই গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হইত ; পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত অধ্যয়নের শেষে সে পরিবারে ফিরিয়া আসিয়া পত্নীগ্রহণ করিত। সে সন্তানাদি উৎপাদন করিয়া সংসারধর্ম পালন করিত এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেই পুত্রের উপর সংসারভার ন্যস্ত করিয়া বনবাসে যাইত, সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞানের সাধনায় সে নিযুক্ত হইত, এবং বৈরাগ্য জন্মিলেই ভৈক্ষচর্যা গ্রহণ করিত। এই ভৈক্ষচর্যাই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস। প্রত্যেক আর্যের পক্ষে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক ছিল। নারদপরিব্রাজকোপনিষদে আছে "ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহীভবেৎ, গৃহাৎ বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা ; যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ; আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজেৎ।" ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, গৃহ হইতে বনবাসী হইয়া প্রব্রজ্যা করিবে ; অথবা অন্য প্রকারে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে ; আত্মাকেই ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করিবে। এই ব্যবস্থার তাৎপর্য এই যে, আত্মসাক্ষাৎকারের তপস্যা প্রত্যেক আর্যের অবশ্যকর্তব্য ছিল। কিন্তু গৃহাশ্রমে মানুষ ভোগবিলাসে রত হইত, কারণ

তারও প্রয়োজন থাকে ; কিন্তু বৈরাগ্য না জন্মিলে আত্মলাভের ইচ্ছাই হয় না ; সেই জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বনবাসে আর্যকে যাইতে হইত, তপস্যার দ্বারা ও জ্ঞানের চর্চা দ্বারা বৈরাগ্য আয়ত্ত করিয়া প্রব্রজ্যা করিতে হইত। আধুনিক কালের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। তিনি যথারীতি সংসার ধর্ম পালন করিয়াছিলেন ; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলেই তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ী ত্যাগ করিয়া পার্ক স্ট্রীটে এক বাড়ীতে গিয়া যতির জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন। আত্মলাভই প্রতি আর্যের জীবনের লক্ষ্য ছিল, এই জীবনব্যবস্থাই ইহা প্রমাণিত করে। ইংরেজ শাসনকালে, সন্ন্যাস পলায়নীবৃত্তি (Escapism) এইরূপ একটা মত এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলিতেন তাহারা সংসারে থাকিয়াই ধর্মসাধন করিবেন ইত্যাদি। এ সকল মতের অসারতা উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় না।

যিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন তাহার জীবনধারার বিস্তৃত বিবরণ নারদপরিব্রাজকোপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। এই উপনিষদ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

যদাতু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতাং শিখাং ত্যজেৎ ॥
পরমাত্মনি যো রক্তো বিরক্তোঽপরমাত্মনি
সর্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ স ভৈক্ষং ভোক্তুমর্হতি ॥

সনাতন পরব্রহ্মতত্ত্ব যখন বিদিত হয়, তখন পরিব্রাজক মাত্র একটী দণ্ড গ্রহণ করিয়া উপবীতের সহিত শিখা ত্যাগ

করিবেন, অর্থাৎ সংসারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন। যিনি পরমাত্মাতে অনুরক্ত এবং পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে বিরক্ত, এবং সকল প্রকার এষণা (কামনা) হইতে মুক্ত, তাহারই ভিক্ষার অন্ন ভোজন করা উচিত (অপরের নহে)। প্রব্রজিত ব্যক্তি অপরের অন্নগ্রহণ করিতেন।

একাকী চিন্তয়েব্রহ্ম মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ।
একাকী নিঃস্পৃহস্তিষ্ঠেন্নকেনাপি সহালপেৎ।
মৃত্যুং চ নাভিনন্দেত জীবিতং বা কথঞ্চন।
কালমেব প্রতীক্ষেত যাবদায়ুঃ সমাপ্যতে॥

মন, বাক্য, কায় এবং কর্মের দ্বারা, একাকী বাস করিয়া ব্রহ্মচিন্তা করিবে; নিঃস্পৃহ হইয়া একাকী থাকিবে, কাহারো সঙ্গে আলাপ করিবে না।

মৃত্যুকে বা জীবনকে অভিনন্দিত করিবে না। যতদিন পর্যন্ত আয়ুঃ সমাপ্ত না হয়, ততদিন মৃত্যুকালের প্রতীক্ষা করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যের অমৃতত্ব লাভ তো পূর্বেই হইয়াছিল, তবে প্রব্রজ্যা করিলেন কেন? মনে হয় তিনি মৃত্যু কালের প্রতীক্ষাতেই তাহা করিয়াছিলেন। যাহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতেন, তাহাদের আচরণের তাৎপর্য কি? আত্ম-সাক্ষাৎকার তাহাদের লক্ষ্য; সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত করিবার জন্যই তাহাদের প্রব্রজ্যার প্রয়োজন হইত।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, একদিকে যেমন প্রব্রজ্যার ব্যবস্থা ছিল, তেমনি অন্যদিকে আন্তরসন্ন্যাসও সমান স্বীকৃতি পাইত। জনক, গার্গী, ইন্দ্র প্রভৃতিই তাহার উদাহরণ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক আরুণিকে অন্তর্যামী তত্ত্বে এবং গার্গীকে অক্ষরব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইতে পারে অন্তর্যামী ও অক্ষর ব্রহ্মের প্রভেদ কি? অন্তর্যামী শব্দের অর্থ, অন্তর অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি সংযত নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি। পৃথিবীময় যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তু আছে, সেই সবই আত্মাতে অধিষ্ঠিত, সুতরাং আত্মা তাহাদের অভ্যন্তরে আছেন, বস্তু সকল যেন শরীররূপে আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তবুও বস্তুসকল আত্মাকে জানিতে পারে না; বস্তুসকল নানারূপ কার্য করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পক্ষে আত্মাই সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; সুতরাং দর্শন শ্রবণ চলনাদি ক্রিয়া আত্মাই করিতেছেন; কিন্তু বস্তুভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে, সর্বত্র একই আত্মা। সুতরাং সর্বত্র আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা। বহু বস্তুর উদাহরণ দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইতেছে ;—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্ যঃ পৃথিবীম্ অন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।

এই মন্ত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এই মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহার অর্থ এই :—যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তরে বর্তমান কিন্তু পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, অন্তরে থাকিয়া তিনি পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এই অন্তর্যামীই তোমার অমৃত আত্মা।

ইনি পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু পৃথিবীর উপরস্থ কোন বস্তু নহেন ; ইনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে আছে, অথচ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহাকে জানেন না ; কারণ এই পৃথিবীই ইহার শরীর, পৃথিবীদেবতার দেহেন্দ্রিয়াদিই ইহার শরীর। এই অন্তর্যামী মুক্তস্বভাব সুতরাং নিজ প্রয়োজনে তাহার কোন কর্ম নাই ; কিন্তু পরের প্রয়োজনে কার্য সম্পাদনই ইহার স্বভাব ; এইজন্য পৃথিবীদেবতার দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারাই ইহার কার্য সাধিত হয়, যেহেতু নিজের দেহেন্দ্রিয়াদি ইহার নাই। ইনি সাক্ষীস্বরূপ, ইহার সান্নিধ্যমাত্রেই পৃথিবীদেবতা কর্মে প্রবৃত্ত হন বা নিবৃত্ত হন। ইনিই ঈশ্বর নারায়ণ নামে খ্যাত ; ইনিই অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন, এই ঈশ্বরই তোমার, আমার সর্বভূতেরও আত্মা ; ইনি সর্বসংসারধর্মবর্জিত, এই জন্য অমৃত।

(অস্য স্বকর্মাভাবাৎ অন্তর্যামিণো নিত্যমুক্তত্বাৎ পরার্থকর্তব্যতা-স্বভাবাৎ পরস্য যৎ কার্যং করণং চ তদেবাস্য, ন স্বতঃ। দেবতাকার্যকরণস্য ঈশ্বরসাক্ষিমাত্রসান্নিধ্যেন হি প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্যাতাম। যঃ ঈদৃগ্ ঈশ্বরঃ নারায়ণাখ্যঃ পৃথিবীং পৃথিবীদেবতাং যময়তি নিয়ময়তি স্বব্যাপারে অন্তরঃ অভ্যন্তরে তিষ্ঠন্, এষ তে আত্মা। তে তবচ মমচ সর্ব্বভূতানাং চ ইতি উপলক্ষণার্থমেতৎ) (শঙ্কর ভাষ্য ৩।৭।৩)।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন—এই অন্তর্যামী দৃষ্ট হন না কিন্তু তিনিই দ্রষ্টা ; তিনি শ্রুত হন না কিন্তু তিনিই শ্রোতা ; তিনি মননের বিষয় হন না, কিন্তু তিনিই মন্তা ; তিনি বিজ্ঞাত হন না কিন্তু তিনিই বিজ্ঞাতা। পৃথিবীদেবতা প্রভৃতি অন্তর্যামীকে জানিতে পারেন না, কেন না তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় হন না ;

কারণ ইনি ভিন্ন অন্য শ্রোতা নাই, দ্রষ্টা নাই, মন্তা নাই বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই সকলের আত্মা।

১

অক্ষর শব্দটী ক্ষর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ, ফোটা ফোটা হইয়া গলিয়া পড়া অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্তিত হওয়া সুতরাং ক্ষর শব্দের অর্থ যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পরিবর্তিত হয়; অক্ষর শব্দের অর্থ, যাহা কখনোই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কোন অবস্থায়ই পরিবর্তিত হয় না। অক্ষর, ব্রহ্মই। গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য অক্ষরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

গার্গীর প্রশ্ন ছিল, যাহা দ্যুলোকের (ব্রহ্মাণ্ডের) উর্ধে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যবর্তী, যাহা অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ বলিয়া কথিত হয়, তাহা কিসে ওতপ্রোত। পূর্বে উদ্দালকের এক প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন যে হিরণ্যগর্ভই সূত্রস্বরূপ হইয়া ইহলোক, পরলোক, এবং সর্ব-ভূতকে একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। গার্গী এই উত্তর শুনিয়াছিলেন; তাই সেই উত্তরের অনুসরণ করিয়া গার্গী প্রশ্ন করিলেন, ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় দ্বৈতবস্তু যে সূত্রের দ্বারা একত্র গ্রথিত হইয়া আছে, সেই সূত্র-রূপী হিরণ্যগর্ভ কিসে ওতপ্রোত। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন দ্যুলোকের উর্ধে, ভূলোকের নিম্নে, ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অন্তর্গত এই সূত্র আকাশে ওতপ্রোত। ইহার তাৎপর্য এই যে—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, এই তিন কালে পৃথিবী যেমন জলে ওতপ্রোত, তেমনি একত্র গ্রথিত দ্বৈতবস্তু সমন্বিত এই হিরণ্যগর্ভ অব্যাকৃত আকাশে ওতপ্রোত। নামরূপাত্মক জগৎ প্রকাশিত হইবার পূর্বে, নামরূপের বীজ সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে বর্তমান থাকে। ইহার নাম

অব্যক্ত। এই অব্যক্ত অনবচ্ছিন্নভাবে থাকে বলিয়া ইহাকে আকাশ বলা হয় (ব্যাকৃতনামরূপবিভিন্নং জগৎ পরিত্যক্ত-ব্যাকৃতনামরূপং বীজশক্ত্যবস্থম্ অব্যক্তশব্দযোগ্যম্) (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২)। (অনবচ্ছিন্নত্বাৎ তদাকাশম্ ১।৪।৫)।

গার্গী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আকাশ কিসে ওতপ্রোত। কিন্তু আকাশ কালত্রয়ের অতীত, সুতরাং বাক্যের দ্বারা বর্ণনীয় নহে; অক্ষরের বর্ণনা তদপেক্ষাও কঠিন। তাই যাজ্ঞবল্ক্য সমস্যা এড়াইবার জন্য প্রকারান্তরে উত্তর দিলেন—আকাশ তাহাতে ওতপ্রোত, যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞগণ অক্ষর বলিয়া অভিবাদন করেন। এই অক্ষর স্থূল নহে, অণু নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, অর্থাৎ ইহা কোন দ্রব্য নহে। ইহা লোহিত নহে, স্নেহপদার্থ নহে, অনির্দেশ্য ছায়া নহে, তমঃ নহে, বায়ু নহে, আকাশ নহে, সঙ্গাত্মক নহে, রস নহে গন্ধ নহে, চক্ষুঃ নহে, শ্রোত্র নহে, বাক্ নহে, মন নহে; ইহার তেজঃ নাই, প্রাণ নাই, মুখ নাই, মাত্রা নাই; ইহাতে অন্তর বা ছিদ্র নাই, ইহার বাহিরও নাই; ইহা কাহাকেও ভক্ষণ করে না, এবং ইহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না। অর্থাৎ অক্ষর সর্ববিশেষণরহিত।

সকল প্রকার বিশেষণের নিষেধের দ্বারাই শ্রুতি অক্ষরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; কারণ যার অস্তিত্ব নাই, তার বিশেষণ সম্ভব নহে, বিশেষণের নিষেধ আরো অসম্ভব। এখন শ্রুতি লোকবুদ্ধি অনুসারে প্রমাণ দিতেছেন। যদি দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে একটী প্রজ্বলিত প্রদীপ দেখা যায়, তবে লোক সহজে অনুমান করে যে, এই প্রদীপের একজন কর্তা নিশ্চয়ই আছে, এবং বিশেষ কোন কারণে সে এই প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। নিকটে গেলে দেখা যায়, সে স্থানে গভীর গর্ত আছে; পথিককে

বাঁচাইবার জন্যই এই প্রদীপ স্থাপিত। ঐ অনন্ত আকাশে চন্দ্র ও সূর্য এই দুই প্রদীপ লম্বমান, সুতরাং তাহাদের কর্তা নিশ্চয়ই আছে ; অক্ষরই সেই কর্তা। উহারা দিনে ও রাত্রিতে আলোক দান করিতেছে ; সুতরাং লোকের কল্যাণে এই দুই প্রদীপ অক্ষরের নির্দেশেই স্থাপিত। চন্দ্র ও সূর্য গুরুভার ; ইহারা পড়িয়া গেলে পৃথিবী প্রভৃতির নাশ হইবে, এজন্য সকলের রক্ষার জন্য এই দুইটী অক্ষর কর্তৃকই বিধৃত। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয় এবং কর্ম সমাপন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে অস্তমিত হয়। ইহাতে অক্ষরের শাসনই প্রমাণিত হয়। সকল বিষয়েই নিয়ম পালিত হয়, ইহাই সূচিত করে যে অক্ষরের শাসন অব্যভিচারী। চেতনাবান্ অসংসারী প্রশাসিতা ব্যতীত অন্য কোন প্রশাসিতার নিয়ম এইরূপ অব্যভিচারী হইতে পারে না। যে প্রশাসিতা সংসারের অন্তর্গত, তাহার শাসন সংসারের কোন না কোন ক্ষেত্রে ব্যভিচরিত হইবেই। কিন্তু অক্ষরের শাসনের ব্যভিচার নাই, সুতরাং অক্ষর চেতনাবান্ অথচ সংসারাতীত।

রাজার কোষরক্ষক রাজার ক্ষুদ্রতম অর্থের আয় ও ব্যয় সযত্নে রক্ষা করেন। নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, মাস, বৎসর সকল যথানিয়মে আবর্তিত হইয়া কালের নিয়ন্তা অক্ষরের নিয়ম পালন করিতেছে। গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদনদী পর্বত হইতে নির্গত হইয়া নির্দিষ্ট দিকেই প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে অক্ষরের শাসনের অমোঘতাই প্রতিপন্ন হয়।

যাহারা নিজের কষ্টার্জিত ধনরত্ন অপরের কল্যাণের জন্য দান করেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাহাদের প্রশংসা করেন। যাহা দেওয়া হয়, যিনি দান করেন এবং যিনি দান গ্রহণ করেন, সেই

সকলই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখেই একত্র হয়, দানকার্য অনুষ্ঠিত হয়, পরে তাহারা চলিয়া যায়। বিভিন্ন প্রমাণে লোকে বুঝিতে পারে যে, দাতা দানের ফল প্রাপ্ত হন। এই সৎকর্মের এই প্রকার ফলপ্রাপ্তি সূচিত করে যে, অক্ষরের শাসনেই তাহা হয়। দেবতারা শক্তিশালী হইলেও যজমানের প্রদত্ত আহুতির দ্বারাই জীবন ধারণ করেন। অক্ষরের শাসনেই ইহা সম্ভব হয়।

এই অক্ষরকে না জানিয়া যিনি বহুসহস্র বৎসর তপস্যা করেন, তার সকল কর্মফলই শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অক্ষরকে না জানিয়া পরলোকে যায়, সে কৃপণ (দুর্ভাগ্য); যে অক্ষরকে জানিয়া পরলোকে যায়, সে ব্রাহ্মণ।

তদ্ বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ, অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ। হে গার্গি, এই অক্ষর কাহারও দৃষ্টির বিষয় হন না, কিন্তু স্বয়ং দৃষ্টিস্বরূপ তাই দ্রষ্টৃ; ইনি শ্রোত্রের অবিষয় অথচ স্বয়ং শ্রোত্রস্বরূপ, ইনি মনের অবিষয় কিন্তু স্বয়ং মতিস্বরূপ; ইনি বুদ্ধির অবিষয় কিন্তু স্বয়ং বিজ্ঞান-স্বরূপ; অক্ষর ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত।

অন্তর্যামীর এবং অক্ষরের সম্পূর্ণ তত্ত্ব আলোচিত হইল। কিন্তু ইহাদের প্রভেদ কি ? ব্রহ্ম বিষয়ে আট প্রকার ধারণা ছিল বলিয়া ভাষ্যে উল্লিখিত আছে ; তাহাদের মধ্যে শুদ্ধ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী বা ঈশ্বর ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব, এই তিনের প্রভেদ ভাষ্যকার নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; টীকাকারেরা অন্য পাঁচ প্রকারের শুধু নামই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, কাহারো মতে মহাসমুদ্রস্থানীয় অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্মের ঈষৎ প্রচলিতাবস্থাই অন্তর্যামী এবং অত্যন্ত প্রচলিতাবস্থাই ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব। কেহ কেহ মনে করিতেন অন্য পাঁচ প্রকার অনন্তশক্তি অক্ষরেরই বিভিন্নশক্তি ; অপরেরা মনে করিতেন, এই সকলই অক্ষরের বিকার। কিন্তু অক্ষর ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি যাবতীয় সংসারধর্মের অতীত ; সুতরাং অক্ষরের অবস্থান্তর সম্ভব নহে। অক্ষরের নিজের শক্তি বা বিকারও শ্রুতিই নিষিদ্ধ করিয়াছেন ; কাজেই ঐ সকল ব্যাখ্যা অসঙ্গত এবং অগ্রাহ্য। তবে ইহাদের কি প্রভেদ ? উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ব্রহ্ম, আত্মা, সৈন্ধবঘন, প্রজ্ঞানঘন, একরস ; সুতরাং ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ বা অভেদ কিছুই নাই ; ব্রহ্ম, আত্মা, অক্ষর, অন্তর্যামী, ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ একই। যাহা কিছু ভেদ, তাহা উপাধিজনিত। নিরুপাধিক, নির্বিশেষ আত্মা অপূর্ব্বম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্, তাহাকে "নেতি নেতি" বলিয়া নির্দেশ করা হয়। নিরুপাধিক, শুদ্ধ আত্মাই, ক্ষরণরহিতস্বভাবহেতু অক্ষর বলিয়া আখ্যাত হন। নিত্য এবং অপ্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিরূপ উপাধি যোগে আত্মাই ঈশ্বর, অন্তর্যামী ; তাঁহাকে নরনারায়ণ বলিয়াও আখ্যাত করা

হয়। অবিদ্যা, কামনা, কর্ম এবং দেহ, প্রাণ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগে আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব। (কস্তর্হি ভেদ এষাম্? উপাধিকৃত এব ইতি ব্রূমঃ। ন স্বতঃ এষাং ভেদোঽভেদো বা। সৈন্ধবঘন প্রজ্ঞানঘনৈকরসস্বাভাব্যাৎ। অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম অবাহ্যম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি চ শ্রুতেঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ ইতি চ আথর্বণে। তস্মান্নিরূপাধিকস্য আত্মনঃ নিরূপাখ্যত্বাৎ নির্বিশেষত্বাৎ একত্বাচ্চ নেতি নেতীতিব্যপদেশোভবতি। অবিদ্যাকামকর্মবিশিষ্টকার্য্যকরণোপাধিঃ আত্মা সংসারী জীবঃ। নিত্যানিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধি আত্মা অন্তর্য্যামী ঈশ্বরঃ। স এব নিরূপাধিঃ কেবলঃ শুদ্ধঃ স্বেন স্বভাবেন অক্ষরঃ পর উচ্যতে। হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতদেবতাজাতিপিণ্ডমনুষ্যতির্য্যক্‌প্রেতাদিকার্য্যকরণোপাধিঃ বিশিষ্টঃ তদাখ্যঃ তদ্রূপঃ ভবতি। তস্মাৎ উপাধিভেদেনৈব এষাং ভেদঃ। বৃঃ উপঃ ৩।৭।১২)

বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন (পঞ্চদশী, চিত্রদীপ ৪)

> স্বতশ্চিদন্তর্যামীতু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
> সূত্রাত্মা, স্থূলসৃষ্টৈব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ॥

স্বতঃ অর্থাৎ মায়ার ও তার কার্যের সম্পর্কশূন্য অনুপহিত পরমাত্মাই চিৎশব্দ বাচ্য; মায়াযুক্ত অর্থাৎ মায়াতে উপহিত যিনি তিনিই ঈশ্বর, তিনিই অন্তর্যামী; সূক্ষ্মসৃষ্টি যোগে অর্থাৎ অপঞ্চীকৃতভূতকার্যসমষ্টি যাহার শরীর সেই হিরণ্যগর্ভই সূত্রাত্মা, তিনি প্রত্যেক সূক্ষ্মদেহে আত্মারূপে স্থিত, স্থূলপঞ্চীকৃতভূতকার্যসমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ড যাহার শরীর, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যিনি উপহিত, তিনিই বিরাট্ নামে আখ্যাত। একই আত্মা উপাধিযোগে বিভিন্ন নামে আখ্যাত হন। কিন্তু আত্মা, ব্রহ্ম, সতত একই;

তাহার প্রকারান্ত বা অবস্থান্তর বলা হয়, ভাষার অসামর্থ্যহেতু। আত্মাই নিত্য।

কেহ বলিতে পারেন, ব্রহ্ম নিত্য, ইহা মানিতেছি; কিন্তু নিত্য ব্রহ্মে স্বগত পরিণাম কেন মানিব না? সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে পঞ্চাশ বৎসর পরে আমি প্রৌঢ়রূপে দেখিতেছি; কিন্তু এই প্রৌঢ় সেই শিশুই, ইহা তো আমি জানি! শিশু ও প্রৌঢ়ের ঐক্য (continuity) আমি স্বীকার করিতেছি; তেমনি নিত্য ব্রহ্মে স্বগত পরিণাম মানিতে আমি বাধ্য। ইহার উত্তরে বেদান্তী বলিতে পারেন, এই মত শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং লৌকিক যুক্তিবিরুদ্ধ, সেই জন্য অগ্রাহ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, সৎ এব, একম্ এব, অদ্বিতীয়ম্, সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ ইদং সর্বং যদয়ম্ আত্মা, আত্মৈব ইদং সর্বম্ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্ ইত্যাদি আত্মা সৎই, একই, অদ্বিতীয়; তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরের সহিত সমভাবে (সচ্চিদানন্দ-রূপে) বর্তমান এবং জন্ম প্রভৃতি বিকাররহিত; এই যাহা কিছু আছে তাহা আত্মাই; আত্মাই এই সব কিছু; ব্রহ্ম কলা অর্থাৎ অংশরহিত এবং পরিণাম প্রভৃতি সর্ব প্রকার ক্রিয়ারহিত। সুতরাং ব্রহ্মের স্বগত পরিণাম শ্রুতিবিরুদ্ধ। লৌকিক যুক্তিরও ইহা বিরুদ্ধ। সদ্যোজাত শিশু ও ভবিষ্যতের প্রৌঢ় একই ব্যক্তি, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শিশুকে কোলে তুলিয়া নাচাও, কিন্তু প্রৌঢ়কে তো নাচাও না; ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে উভয়কে তুমিই এক মনে কর না। আম্রশাখায় উদ্গত অপক্ক ক্ষুদ্র আম্রই ভবিষ্যতের পক্ক আম্র, ইহা তুমি বুঝিতেছ; কিন্তু অপক্ক আম্রটী খাইয়া পক্ক আম্রের আনন্দ অনুভব করিবে না। এই ভাবে তুমিই প্রমাণিত করিতেছ, উভয়ে এক নহে।

বেদের নিরুক্তের অভিধানের রচয়িতা যাস্ক বলিয়াছেন,

পদার্থমাত্রেরই ছয় প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে ; ইহাদের নাম, ছয় ভাববিকার—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি। যে মুহূর্তে পদার্থের উৎপত্তি হইল, তখনই তার অবস্থা, জায়তে ; পরমুহূর্তেই তার সত্তা অপরে বোধ করিল, ইহা অস্তি ; ক্রমে পদার্থটী বাড়িতে লাগিল, ইহা বর্দ্ধতে ; বাড়িতে বাড়িতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল, ইহা পরিণমতে ; মুহূর্তেই ক্ষয় আরম্ভ হইল, ইহা অপক্ষীয়তে, তারপরই পদার্থটী বিনষ্ট হইল, ইহা বিনশ্যতি। কোন পদার্থই এই ভাববিকার হইতে অব্যাহতি পায় না। শুধু ব্রহ্ম বা আত্মাই ভাববিকারের অতীত ; তাই ব্রহ্ম অজ, নিত্য, শাশ্বত। সুতরাং ব্রহ্মে স্বগতপরিণাম অসম্ভব। ব্রহ্ম সদাতন।

ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপতার আরো প্রমাণ আছে। মানুষ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে রূপ দেখে, শব্দ শোনে, গন্ধ আঘ্রাণ করে, রস আস্বাদন করে, স্পর্শ অনুভব করে ; রূপ, শব্দ গন্ধ, রস, স্পর্শ, এইগুলি জ্ঞানের বিষয় ; দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, এইগুলি জ্ঞান বা অনুভূতি ; জাগ্রৎজ্ঞানের বিষয়গুলি পৃথক পৃথক, কিন্তু জ্ঞান বা অনুভূতি একই প্রকার। স্বপ্নেও দ্রষ্টার জ্ঞানের বিষয়গুলি পৃথক পৃথকই ; কিন্তু জ্ঞান একই। সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া মানুষ বলে, সে আরামে ঘুমাইয়াছিল, কিছুই জানিতে পারে নাই। ইহার অর্থ, কিছুই জানি নাই, এই অবস্থা অনুভব করিয়াছিল ; তাহা না হইলে কিছুই জানি নাই, একথা বলা সম্ভব হইত না। সে কালে জ্ঞানের অন্য বিষয় ছিল না, শুধু অজ্ঞানই তাহার বোধগম্য হইয়াছিল ; সুপ্তি হইতে উঠিয়া সে ঐ অনুভূতি স্মরণ করিয়াই ঐ কথা বলিয়া থাকে, যে কিছুই জানি নাই ; সুতরাং জানি নাই,

ইহা স্মৃতিজ্ঞান, আরামবোধও স্মৃতিজ্ঞান। পূর্বে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়াছিল; তাহাই স্মৃতিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে প্রমাণিত হয়, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন হইলেও এক, অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান তাহাতে নিত্য বর্তমান। এই জ্ঞানের নাম সংবিৎ। সংবিৎ-এর উদয় নাই, সুতরাং অস্তও নাই; প্রতি দিনে, মাসে, বৎসরে, শতাব্দীতে এই সংবিৎ একই ভাবে বর্তমান। আবার যাহা আমাতে, তাহা প্রতি মানুষে, অতীত ও বর্তমান সকল মানুষে একই ভাবে বর্তমান। এই সংবিৎ, ব্রহ্ম, আত্মা।

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমায়াতি সংবিদ্ এষা স্বয়ংপ্রভা ॥ (বিদ্যারণ্য)।

অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে, সকল কালে, বিভিন্ন মাস, বৎসর, যুগ, কল্পেও সংবিৎ একই প্রকার; ইহার উদয় হয় না, অস্তগমনও হয় না। এই সংবিৎ, জ্ঞান, স্বয়ংপ্রভ, স্বয়ংপ্রকাশ; ইহার প্রকাশের জন্য অন্য জ্যোতির অপেক্ষা নাই। ইহা স্বয়ংজ্যোতিঃ। এই স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃই ব্রহ্ম, আত্মা।

অমৃতত্বের আলোচনা সমাপ্ত হইল। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে অমৃতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ ভাষ্যকারের ভাষ্যের অনুকরণে এই দুই ভাগ সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছে; একই বিষয়ের দুইবার উল্লেখের তাৎপর্য এবং তাহাদের পাঠভেদের তাৎপর্যও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যে উল্লিখিত প্রজ্ঞা ও প্রাণের একত্ব, কৌষিতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সমগ্র ইন্দ্র-প্রতর্দন সংবাদের আলোচনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উক্ত দুই উপনিষদ ভাগের অবলম্বনে রচিত ব্রহ্মসূত্রগুলিও (প্রতর্দন অধিকরণ ১।১২৮-৩১ সূঃ ও বাক্যান্বয়ি অধিকরণ ১।৪।১৯-২২ সূত্র) সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যার তাৎপর্য, নারদ পরিব্রাজকোপনিষদের অংশসকল উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত, অন্তর্যামী ব্রহ্মের তত্ত্ব এবং অক্ষরব্রহ্মের তত্ত্ব, বৃহদারণ্যকের ৩য় অধ্যায় ৭ম ব্রাহ্মণ ও ৩য় অধ্যায় ৮ম ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু একটী প্রশ্ন এখনও অবশিষ্ট আছে। উপদিষ্ট অমৃতত্বের যোগ্য অধিকারী কে? জননী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞ পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাই এই তত্ত্বের উপদেশ পাইয়াছিলেন। ইহার জন্য কি প্রয়োজন? জননী বিপুল বিত্তত্যাগ করিয়াই অমৃতত্ব চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যাহার অন্তরে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে এবং যিনি বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই অমৃতত্বের যোগ্য অধিকারী।

স্মরণে রাখিতে হইবে, অমৃতত্ব কোন বস্তু নহে, যাহা ভবিষ্যতে লাভ হইবে। অমৃতত্ব শব্দের অর্থ মোক্ষ। ব্রহ্মই, আত্মাই মোক্ষস্বরূপ। যাহাকে জীবরূপে কল্পনা করা হয়, সে ব্রহ্মস্বরূপই, আত্মাস্বরূপই। কিন্তু ভ্রমের বশে সে নিজেকে অব্রহ্ম অনাত্মা বলিয়া ভাবে। এই ভ্রমনাশই অমৃতত্বের একমাত্র সাধনা, তপস্যা। আত্মা ব্রহ্ম সততপ্রকাশ; জীবের ভ্রম দূর হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপ আত্মস্বরূপ হয়। ইহাই অমৃতত্ব।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, কোন কোন ব্রহ্মসাধক বলেন ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দরসপানই কৃতকৃত্যতা। কোন কোন ভক্তসাধক, সাধনার দ্বারা ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করেন, সতত দেবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করেন। এই সকল ব্রহ্মসাধক ভক্ত-সাধক অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন কি? উত্তরে বলা যায়, এই প্রকার সকল সাধকই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে, ঐ প্রকার ব্রহ্মসাধক, ভগবৎসাধক, ব্রহ্মকে ভগবানকে আত্মা হইতে পৃথকবোধেই সাধনা করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবাস্তং পরাদুঃ যোঽন্যত্রআত্মনো দেবান্ বেদ যিনি দেবগণকে আত্মা

হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, দেবগণ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং ঐ সকল সাধক অমৃততত্ত্বের পথিক নহেন; "ইমে দেবা ইমানি ভূতানি, ইদং সর্বং যদয়মাত্মা" একথা ঐ সাধকেরা উপলব্ধি করেন না। সুতরাং তাহাদের সাধনা দ্বৈতসাধনাই।" শ্রুতি বলেন 'যথাক্রতুঃ তথা ভবতি" যাহার যেরূপ সংকল্প, সে তাহাই হয়। সাধনার ফলে ঐ সাধকেরা অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ইহারা আর জগতে ফিরিয়া আসেন না (ন স পুনরাবর্ত্ততে)। পরে অপরব্রহ্মের সহিত ঐ সাধকেরাও পরব্রহ্মে লীন হন। ইহাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট ক্রমমুক্তি।

যিনি অমৃতত্বের সাধক, আত্মাই তাহার একমাত্র কাম্য, আত্মাকে জানা, আত্মাকে উপলব্ধিই তাহার একমাত্র চেষ্টা। একমাত্র আত্মাকেই কামনা করিতে করিতে তাহার অপর সকল কামনা বিদূরিত হয়; তিনি আত্মকাম হন, আপ্তকাম হন, নিষ্কাম হন। তখন তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না; তিনি ব্রহ্মই হন, ব্রহ্মস্বরূপই হন। অথ অকাময়মানো যোঽকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, যাজ্ঞবল্ক্যের এই উপদেশ (৪।৪।৬) এই ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ারই উপদেশ। যিনি আত্মকাম, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হন। ইহাই অমৃতত্ব। জননী মৈত্রেয়ী ইহাই চাহিয়াছিলেন। আজিও যে ইহা চায়, সে তাহা পায়। অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ (৪।৪।২৫)।

ওঁ তৎ সৎ।